দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের কমিউনিস্টদের মতো মিথ্যাচারী পৃথিবীতে কম

— পৃঃ ১০

কেবল 'বিজেপি ঠেকাও' ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মেরুকরণ

— পৃঃ ৩৫

৭৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ।। ২৭ ভাদ্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

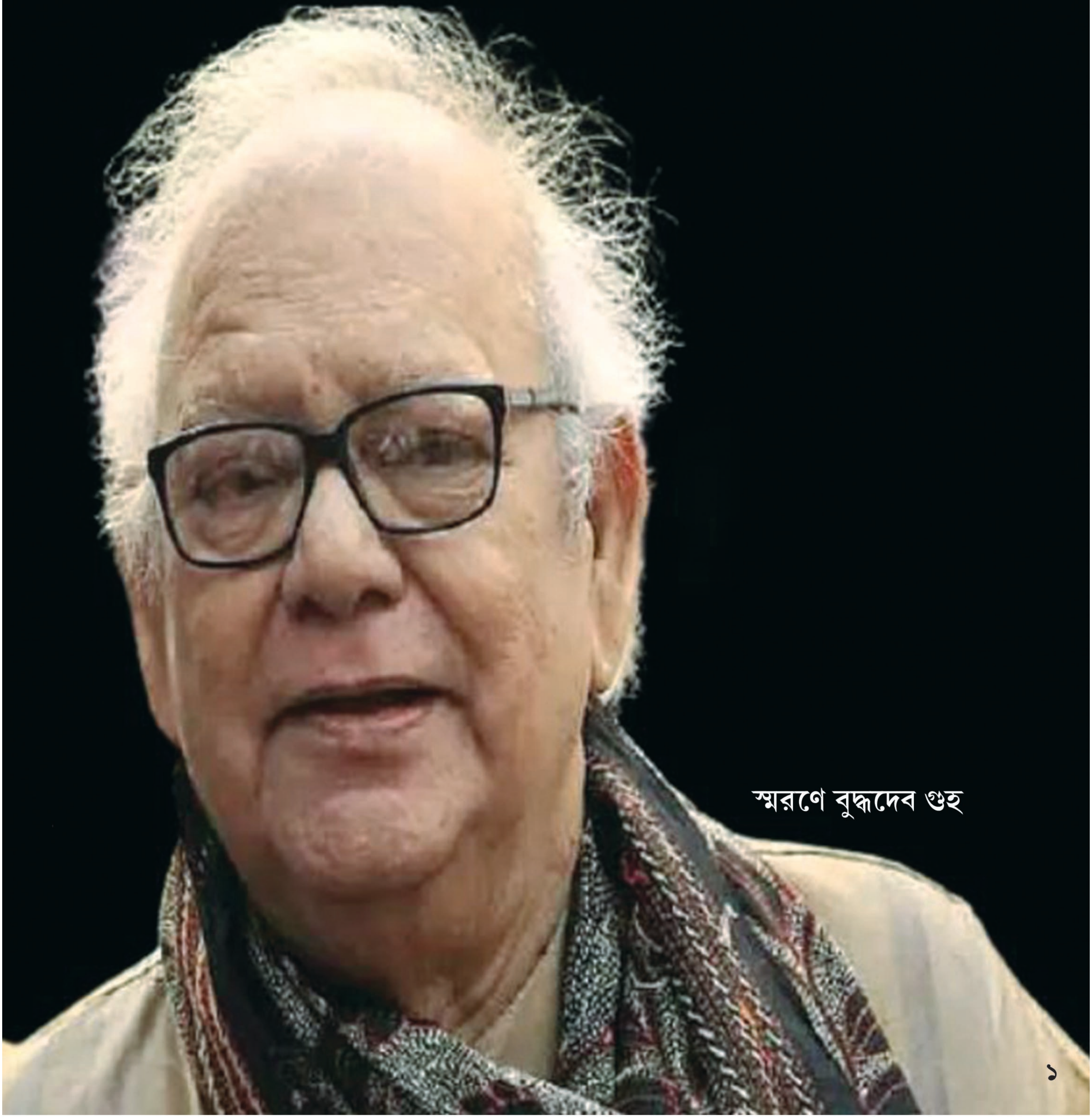

স্মরণে বুদ্ধদেব গুহ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE™
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৩ সেপ্টেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

‘গদ্দার’ ফিরছে ঘরে, তাই তৃণমূসের ত্রাহি রব ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কি ভবিষ্যতের অলক্ষ্মী! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে টিউশনি ব্যবস্থার মহামারি ☐ চেতন ভগত ☐ ৮

ভারতের কমিউনিস্টদের মতো মিথ্যাচারী পৃথিবীতে কম ☐ বুদ্ধদেব গুহ ☐ ১০

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের বিশেষ কামরায় উঠলে দেখা হতো ঋজুদার সঙ্গে ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ১৩

মাধুকরী শেষ করে কোয়েলের কাছে ☐ হীরক কর ☐ ১৫

আমাকে আর লুকোচুরি খেলতে হবে না ☐ সিদ্ধার্থ সিংহ ☐ ২৩

ভারতকে গর্বিত করেছেন প্যারালিম্পিয়ানরা ☐ নিলয় সামন্ত ☐ ২৫

জগন্নাথ থেকে মহাকবি কালিদাস ☐ ড. অশোক কুমার দাস ☐ ৩১

হারিয়ে যাওয়া এক বাঙ্গালি ধনকুবের কথা ☐ কৌশিক রায় ☐ ৩৩

কেবল ‘বিজেপি ঠেকাও’ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মেরুকরণ হয়েছে ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৩৫

গোপাল পাঁঠার জন্য বেঁচে গিয়েছিল হাওড়া ব্রিজ ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৩৮

সাক্ষাৎকার : হিন্দুত্ববাদে আস্থা ছিল বুদ্ধদেবের ☐ ৪৩

বুদ্ধদেব গুহর ‘সারস্বত’ ও আনন্দবাজার পত্রিকা ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ৪৫

হাঙ্গেরির নিকোলেটটা ইনসেজের গবেষণায় স্তম্ভিত সারাবিশ্ব ☐ নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য ☐ ৪৬

শিক্ষকদের বিষপানে কলঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গ ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৪৮

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি খাদে পড়েছে তৃণমূল আমলে ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐

প্রকাশিত হবে
২০ সেপ্টেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দুর্গাপূজার নেপথ্যে

এই বিজ্ঞাপন লেখার সময় দুর্গাপুজোর আর চৌত্রিশ দিন বাকি। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। যারা আলোর কাজ করেন তারাও শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ঢাকিঢুলিদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই বায়না পেয়ে গেছেন তারা অনেকটাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু যারা এখনও পাননি তাদের দিন কাটছে দুশ্চিন্তায়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা পুজোর নেপথ্যে থাকা এই মানুষগুলোকে নিয়ে। সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন রঙিন ছবি ও সাক্ষাৎকার।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অরণ্যপুরুষ

প্রকৃতির সম্মুখে কি সবাই নতজানু হইতে পারে? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হইল, না, পারে না। কারণ প্রকৃতির নিকট নতজানু হইবার নিমিত্ত যে দীক্ষার প্রয়োজন তাহা স্কুল-কলেজের মুষ্টিভিক্ষায় লভ্য নহে। সদ্যঃপ্রয়াত বুদ্ধদেব গুহ ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত লেখক। তিনি জানিতেন সাধারণের দৃষ্টিতে প্রকৃতি জড়পদার্থ হইলেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাহা চিন্ময়ী সত্তায় পরিণত হয়। সপ্রাণ প্রকৃতিকে অন্তরে ধারণ করিতে চাহিলে তাহাকে ভালোবাসিতে হয়, তাহার সম্মুখে নতজানু হইতে হয়। বস্তুত, জড়কে প্রাণিত করিবার শিক্ষা ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এই শিক্ষার প্রেরণাতেই অমিতাভ বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন। ঋষি চার্বাক ও তাঁহার দার্শনিক সম্প্রদায় পত্তন করিয়াছিলেন এক বিশেষ জীবনদর্শনের। সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া বাংলাসাহিত্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি যিনি গ্রামবাঙ্গলার লক্ষ্মীস্বরূপা প্রকৃতিকে তাঁহার অনুপম গল্পসম্ভারের মাধ্যমে সাধারণ বাঙ্গালির হৃদয়ে ভাবময় ও প্রেমময় সত্তায় উপস্থিত করিয়াছেন। সেই হিসাবে বুদ্ধদেব গুহকে রবীন্দ্রনাথের একজন সার্থক উত্তরসূরি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কোনও লেখকের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার সাহিত্যের হৃদ্দমুদ্দ করিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বুদ্ধদেব গুহের ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বঘোষিত বোদ্ধাগণ বুদ্ধদেবের সৃজনকর্মের বিশ্লেষণে লাগিয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব সুলেখক তো বটেই, সুসাহিত্যিকও। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সাহিত্য হইল সহিতের ভাব। অর্থাৎ, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইল পাঠকের অন্তরের সহিত সেতু রচনা করা। যে লেখক মানুষের অন্তরকে বাঁধিতে পারেন তিনিই সাহিত্যিক। বুদ্ধদেব গুহ সেই কারণেই সুসাহিত্যিক। তিনি বাঙ্গালিকে অরণ্য চিনাইয়াছেন। আরণ্যক প্রকৃতিকে ভালোবাসিতে শিখাইয়াছেন। যদিও বাংলাভাষায় এই ধারার সাহিত্যের পথপ্রদর্শক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার অমর সৃষ্টি চাঁদের পাহাড় আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু বিভূতিভূষণ যে পথের সন্ধান দিয়াছেন তাহাকে বহুবিধ ভাবের আয়োজনে এবং অলংকরণে সুরম্য করিয়া তুলিবার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বুদ্ধদেব গুহের। মাধুকরী, একটু উষ্ণতার জন্য, কোয়েলের কাছে, পর্ণমোচী ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি যেমন অরণ্যকে বাঙ্গালি মানসের নিকটবর্তী করিয়াছেন, ঠিক তেমনই দেখাইয়াছেন হৃদয়ের উষ্ণতা মানবিক সম্পর্কগুলিকে কতখানি মাধুর্যময় করিয়া তুলিতে পারে। পাঠক অনুভব করিয়াছে, শরীরী আবেগ তীব্র হইলেও তাহা সময়বিশেষে ভালোবাসার টানে পরস্পরের কাছে আসা মানুষদুইটিকে অসহায় করিয়া তুলিতে পারে। নিজের পেশায় চূড়ান্ত সফল একজন মানুষও যে নিঃসঙ্গ হইতে পারেন এবং মাধুকরী উপন্যাসের 'আজীব আদমি' পৃথু ঘোষের মতো জীবনের গজদন্তমিনার হইতে অবতরণ করিয়া বনচর রাখাল ঠুঠা বৈগার সামনে জানু পাতিয়া বসিতে পারেন— বুদ্ধদেব গুহ না লিখিলে আমরা কেমন করিয়া জানিতাম! ইহার পাশাপাশি রহিয়াছে চাপরাশ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে তিনি সাধুসন্ত, বৈরাগী ও বোষ্টমদিগের চক্ষু দিয়া ভারতবর্ষকে দেখিয়াছেন। আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন প্রাচীন ও পরম্পরাগত একটি দেশ এবং সেই দেশের সহজ-সরল ও স্বধর্মনিষ্ঠ মানুষকে। সাহিত্যের রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াও তিনি দেশের ইতিহাস ভুলিয়া যান নাই। সব মিলাইয়া বলা যাইতে পারে, বুদ্ধদেব গুহ তাঁহার সারস্বত উত্তরাধিকারের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিলেন এবং মহাকালও তাঁহাকে ভাবীকালের দিকে আগাইয়া দিয়া লেখকের সাহিত্যিক দায়বদ্ধতার পুরস্কার প্রদান করিয়াছে।

বুদ্ধদেব গুহের লোকান্তর প্রাপ্তিতে বাংলাসাহিত্যে যে-শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। কারণ, প্রতিভা থাকিলেই মরমি লেখক হওয়া যায় না। তাহার জন্য দরদি অন্তঃকরণের প্রয়োজন। আজিকার মস্তিষ্ক ও কলমসর্বস্ব বাঙ্গালি লেখকদের কাছে এতবড়ো দাবি লইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বিড়ম্বনায় ফেলা হইবে মাত্র। তবুও অপেক্ষা থাকিবে। কেহ আসিবেন এবং আসিয়া এই নিদারুণ শূন্যতা পূর্ণ করিবেন। বাঙ্গালির প্রিয় অরণ্যপুরুষ যেইখানেই থাকুন, ভালো থাকুন— ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা ।

সুভাষিতম্

যোগক্ষেমায় ধর্মস্য সভ্যতায়াঃ সুসংস্কৃতেঃ।

নৈবান্যো বিদ্যতে পন্থাঃ লোক সংঘটনং বিনা।।

ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য সমাজ সংগঠনের বাইরে অন্য কোনও পথ নাই।

‘গদ্দার’ ফিরছে ঘরে, তাই তৃণমূলে ত্রাহিরব

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২৯৩ আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দলছুট ১৫৮ প্রার্থী নিয়ে ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচন লড়েছিল বিজেপি। যা কিনা মোট দলীয় প্রার্থীর ৫৪ শতাংশ। তাদের বেশিরভাগ পরাজিত হন। ৩২ জন নির্বাচন জেতেন। অর্থাৎ ৭৭ জয়ী বিজেপি বিধায়কের মধ্যে ৩২ জন দলছুট তৃণমূল। ভোটের আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলছুটদেরই ‘গদ্দার’ বলেছিলেন।

তিনি সেই গদ্দারদের আবার দলে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। মুকুল রায় থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন। তীর্থের কাকের মতো অনেকে অপেক্ষা করছেন। যথারীতি বিজেপি নেতারা আদর্শের দোহাই দিয়ে হাত তুলে নিয়েছেন।

৭৭ আসন থেকে বিজেপি ইতিমধ্যেই ৭১-এ নেমে এসেছে। তাদের দুই বিধায়ক সংসদে ফিরে গিয়েছেন। চারজন তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা সময়ের সঙ্গে বিজেপির এই সংখ্যা ক্রমশই কমতে থাকবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ‘এটা বিজেপির ব্যর্থতা যে তারা এই দলবদল আটকাতে পারছেন না। বিজেপির টিকিটে জিতে যাওয়া প্রার্থীরাও তৃণমূলে ফিরে যাচ্ছেন। তাহলে নির্বাচনের আগে যারা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন তাদের আদর্শ যাচাই না করেই কি দলে নেওয়া হয়েছিল? তাদের কি জানানো হয়নি যে বিজেপি- আদর্শবাদী দল? আর তাই যদি হয় তাহলে এখন কেন আদর্শের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে?’

এই দল বদলের কাজে মমতা তার দলের কিছু দ্বিতীয় আর তৃতীয় সারির নেতাদের লাগিয়েছেন। আপাতত প্রথম সারির নেতারা পুরোমাত্রায় অন্তরীণ।

কিন্তু কেন? প্রকাশ্যে না বললেও তৃণমূলের কিছু নেতা তাঁর এই পদক্ষেপ মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। বলা চলে তাঁরা বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ। আড়ালে আবডালে তারা মমতার সমালোচনাও করছেন। তাঁদের মতে প্রয়োজনের তুলনায় মমতার অনেক বেশি বিধায়ক রয়েছে বিধানসভায়। তই এই সব দলছুটদের দলের বাইরে রেখে শাস্তি দেওয়াই কাম্য। এ ব্যাপারে ওই নেতাদের মত, ‘যারা মমতার পাশার দান উলটে দিতে চেয়েছিল। তার সরকার ফেলে দিতে চেয়েছিল, আজ তারাই মমতার পাশার ঘুঁটি হচ্ছেন। বিজেপির এঁটো পাত মমতার ঘরে তোলা উচিত নয়’।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোড় খাওয়া চতুর রাজনীতিক। ২০১১, ২০১৬ ও ২০২১-এর তিনটি রাজ্য নির্বাচনে তিনি তাঁর দলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ‘অ্যান্টি ইনকামবেন্সি বা বিরোধী ক্ষমতা’ কাজ করেনি। মানতেই হবে সারা দেশের রাজ্য-রাজনীতিতে এ বিরল নজির।

বিজেপি ও সিপিএমের মতো সুসংবদ্ধ দলকে তিনি রুখে দিয়েছেন। তাই কেবল বিজেপিকে রাজনৈতিক ভাবে নিঃশেষিত করাই নয় দলছুট ‘গদ্দর’-দের ফিরিয়ে তিনি তাঁর নিজের দলের মধ্যেও বার্তা দিতে চান— ‘তিনি দলের প্রথম ও শেষ কথা’।

তিনবার নির্বাচন জেতায় কিছু তৃণমূল নেতার মাথা ভারী হয়ে গিয়েছে। আপাতত মমতা সেই মাথা মুড়িয়ে দিতে চান। আর তাই দলছুট তৃণমূল নেতাদের তিনি আবার ঘরে তুলছেন। মাথাভারী নেতাদের ডানা ছাঁটতে আর চাপে রাখতে।

মমতা জানেন জয়ললিতা বা মায়াবতীর মতো তিনিও ব্যক্তিনির্ভর দল চালান। ফলে প্রতিনিয়ত তাঁকে দলের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করতে হয়। বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেসের মতো ‘কেন্দ্রায়িত বা কেন্দ্রীভূত’ ও ঢিলেঢালা দল চালানোর চাইতে তা অনেক কঠিন কাজ। তাই তিনি নিজে যেমন সাংগঠনিক চাপে থাকেন অন্যদেরও তাই রাখতে চান।

যে দলে সংগঠনের চাইতে ব্যক্তি বড়ো, সেখানে জয়-পরাজয় সবটাই নির্ধারিত হয় সেই ব্যক্তির অঙ্গুলি হেলনে। আর মমতাই সেই ব্যক্তি। ফলে শুরু হয়েছে দল বদলু ‘গদ্দার’-দের আনাগোনা। দলে ফেরানোর ‘হরির লুট’। এতে বিজেপির কোনও চাপ নেই। অনেক বিজেপি নেতাই মনে করছেন ‘বেনোজল’ বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। তাতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে শুকনো ডাঙায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে সুবিধা হবে। কিন্তু তৃণমূলে আপাতত ত্রাহিরব উঠেছে। মমতা তার হোতা।

(লেখক প্রাক্তন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

তৃণমূলে দল বদলু ‘গদ্দার’-দের আনাগোনা। দলে ফেরানোর ‘হরির লুট’। এতে বিজেপির কোনও চাপ নেই। অনেক বিজেপি নেতাই মনে করছেন ‘বেনোজল’ বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। তাতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে শুকনো ডাঙায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে সুবিধা হবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কি ভবিষ্যতের অলক্ষ্মী!

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

আজ আপনাদের দরবারে আমি একটা সহজ প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। আসলে চারিদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে এত হইচই দেখে আমার মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সে প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছ থেকে সব পাচ্ছি না বলেই আপনাদের শরণ নিলাম। প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে মা-বোনেদের লাইন দেখে সত্যিই খারাপ লাগছে। আমি স্বচক্ষে উদ্বাস্তু শিবির দেখিনি। ছবিতে দেখা সেই লাইন যেন আমার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, সরকারের তরফে যেমন প্রচার তাতে মনে হচ্ছে তারা সাধারণ মানুষকে ভিক্ষা দিচ্ছে। হিসেব বলছে গোটাটাই ভিক্ষের টাকায় মানে ঋণের টাকায় দেওয়া হচ্ছে। যে ঋণ শোধ করার কোনও পরিকল্পনা নেই। ফলে আগামীদিনে এই ঋণের বোঝা বইতে হবে তাঁদেরই যাঁরা আজ হাত পেতে টাকা নেবেন। মাসে ৫০০ টাকা কী আর এমন। কিন্তু রাজ্যের সব মহিলার হাতে এই টাকা পৌঁছে দিতে সরকারের প্রয়োজন হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতি মাসে।

ঋণ করে ঘি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে অমর হয়েছেন চার্বাক দার্শনিকরা। এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য— লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি প্রকল্পগুলি কি খাদ্যবিলাসীর ঘি-প্রাপ্তি! না কি নিরন্নের অন্ন? প্রথমটা হলে আপত্তি নেই। সকলেরই ঘি খাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও নুন-ভাত খাওয়ার পয়সা নেই!

এই সব প্রকল্পে বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এর ফলে যে ঋণের বোঝা বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজ্যবাসীকে বইতে হবে, তার অর্থে কি এই প্রকল্পগুলি চালানো উচিত? গরিবের জন্য আর্থিক সহায়তা হতেই পারে। মনে রাখতে হবে, বিশ্বব্যাঙ্ক কিন্তু ঋণ দেয় ‘নারী ক্ষমতায়ন’-এর জন্য জন্য। এই প্রশ্নও উঠতে পারে যে, ‘নারী ক্ষমতায়ন’-এর সরকারকে কেন টাকা ধার করতে হবে? বিশেষত ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্প নিয়ে এমন প্রশ্ন সমীচীন। কারণ, এটা শুধু দরিদ্র পরিবারগুলির জন্যই নয়। আর্থিক ভাবে সচ্ছল পরিবারের মহিলাদের সহায়তায় কেন বিশ্বব্যাঙ্কের দুয়ারে লাইন দেবে সরকার?

আর নারীর শক্তি বাড়ানো কি শুধুই মাসে মাসে সামান্য টাকা দিয়ে সম্ভব! কারণ, নারীর সক্ষমতা বাইরে থেকে টাকা দিলেই হয় না। অন্তরের শক্তি প্রকাশ করার পথের বাধাও তো সরাতে হবে। কিন্তু রাজনীতি করতে গিয়ে, নারী জনসমর্থন পাওয়ার তাগিদে নারীর স্বাতন্ত্র্যকেই তো উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রশ্ন শুধু ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ নিয়ে নয়।

কারণ, এক্ষেত্রে আর্থিক অসমতা বিষয়টা যেমন আছে তেমন লিঙ্গ অসমতার প্রশ্নও আছে। সেই পুরুষ-নারী বৈষম্য কমানোর দায় অবশ্যই সরকারের। আর্থিক সহায়তা দান তার একটা অস্থায়ী উপায়। স্থায়ী উপায় হলো স্বনির্ভর করে তোলা। মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছায় রোজগার, প্রেম, বিবাহ এবং সন্তানধারণ যেমন করবেন, তেমনই নিজের ইচ্ছায় আর্থিক লেন-দেনও করবেন। এটা হওয়া দরকার। স্বামী, পুত্রের দিকে তাঁদের তাকিয়ে থাকতে হবে কেন! কিন্তু এটা ঠিক যে অনেক সচ্ছল পরিবারেও মেয়েদের সেই সুযোগ কম। সরকার মেয়েদের হাতে অর্থ দিয়ে, তাদের ইচ্ছানুসারে খরচের অধিকার বাড়াতেই পারে। কিন্তু সেটা কতদিন পর্যন্ত করতে হবে?

কন্যাশ্রী, রূপশ্রীও কি নারী ক্ষমতায়ন বাড়াবে? এই সব অনুদান আসলে কন্যার বিয়ের খরচে সরকারি ‘ভরতুকি’ হিসেবেই দেখা হচ্ছে বহু পরিবারে। এ যেন সরকারি উদ্যোগে ‘কন্যাসন্তান জন্মাইবার ‘ক্ষত’ ঢাকিতে ‘ক্ষতিপূরণ’-এর মলম’। তা হলে কাজের কাজ হলো কোথায়?

এবার একটা প্রশ্ন শুধুই পাঠিকাদের জন্য। আপনাদের সামনেও সরকারি কর্মীদের সম্পর্কে করা উক্তি ফের উচ্চারিত হবে না তো? এই প্রকল্প চালাতে সরকারি কোষাগারে এমনিতেই টাকা নেই। ঋণ নিয়েই সব হচ্ছে। যে দিন ঋণ পাওয়া বন্ধ হবে সে দিন হয় তো এক নারী কণ্ঠেই নারীদের শুনতে হবে, ‘এটা দয়ার দান। পাওয়া যাচ্ছে না বলে ‘ঘেউ ঘেউ’ করবেন না।’ ■

অতিথি কলম

চেতন ভগত

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে টিউশনি ব্যবস্থার মহামারি

যারা টিউশন নিতে পারলো না আর যারা পারল লক্ষ্য পুরণের ক্ষেত্রে সক্ষমরাই তো অনায্যভাবে এগিয়ে গেল, কেননা তারা বাড়তি সুলুক সন্ধান পরীক্ষার খুঁটিনাটি জানার সুযোগ পেয়েছে। এই বৈষম্যই কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য?

সম্প্রতি চীন সরকার একটি ভয়ংকর প্রায় ড্রাকোনিয়ান আইনের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা জগতে ফুলে ফেঁপে ওঠা প্রাইভেট টিউশনের রমরমা বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। নতুন নীতিতে বেসরকারি টিউশন দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলিকে অলাভজনক হিসেবে চালানো হয় বলে লিখিত ঘোষণাপত্র দিতে হবে। এই সমস্ত টিউশন দেওয়ার বিশালাকার প্রতিষ্ঠানগুলি (ভারতেও কোটা যেমন) দেশের শেয়ার বাজারে অংশ নিতে পারবে না বা বিদেশি মূলধনও তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবে না। স্কুলেও সরকারিভাবে যেসব দিনে দেশে ছুটি থাকবে সেই দিনগুলিতে এরা ছাত্রদের জন্য কোনো ক্লাস রাখতে পারবে না। সপ্তাহান্তে সব বয়সের শিক্ষা প্রদান পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সূত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবকদের সেই সমস্ত বিদ্যালয় ও তাদের অধীন শিক্ষকদের যারা ব্যক্তিগত শিক্ষকতার মাধ্যমে বাড়তি রোজগার করছে তাদের নাম জানাতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এর ফল তারা হাতে নাতে পেয়েছে। চীনা এডটেক কোম্পানিগুলি যারা ব্যাপক হারে প্রাইভেট টিউশন দেয় তাদের শেয়ার বিদেশি শেয়ার বাজারগুলিতে ধসে গেছে। এই সব শেয়ারের মালিকদের হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, কেননা শেয়ারের দাম ভীষণভাবে পড়ে গেছে। এই ধরনের বহু কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার পথে।

হ্যাঁ, একথা তো নিশ্চিত ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চীন কখনোই মানদণ্ড বলে বিবেচিত হতে পারে না। চীনে গণতন্ত্র নেই। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থার ওপর রাতারাতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের বেআইনি ঘোষণা করলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগকারী মানুষেরা সর্বস্বান্ত হবেন। সামগ্রিকভাবে দেশের বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সেন্টিমেন্টের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তবু আমাদের দেশেও এখন সময় এসেছে এটা স্বীকার করার যে আমরা প্রাইভেট টিউশনের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে আসছি। চীনের পদ্ধতিতে সমাধান আমাদের দেশের নিদান না হলেও এখানেও সমস্যাটি কিন্তু রয়েছে। টিউশনের চাপ দিয়ে আমরা আমাদের পড়ুয়াদের বহু ক্ষেত্রেই মানসিক রোগী করে ফেলছি। আমরা তাদের যে সমস্ত পরীক্ষায় (যা প্রচলিত পদ্ধতিতে নেওয়া হয়) তীব্রভাবে প্রতিযোগিতায় নামাই সেখানে কিন্তু প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। সাফল্য আসে অনেকটাই লটারির মতো সিকে ছিঁড়ে। অবশ্যই এটা নতুন কোনো ইস্যু নয়। দেশে টিউশন ক্লাস যুগ যুগ ধরে চলছে। এক্ষেত্রে আমার কিশোর বয়েসে এক শিক্ষয়িত্রীর বাড়ির কথা মনে পড়ছে। একটি খাবার টেবিল ঘিরে আমরা বেশ কিছু পড়ুয়া বসতাম, ম্যাডাম আনাজ (বিট, গাজর) কাটতে কাটতে আমাদের স্কোয়ার রুট বোঝাতেন।

সে সময় পদ্ধতি কিন্তু যথেষ্ট আলাদা ছিল। তিনি আমাদের হোমওয়ার্ক করার দিকে মনঃসংযোগ করাতেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে এখনকার শিক্ষা প্রদানের কেন্দ্রগুলি কিন্তু বিশাল। শুনলে অবাক হওয়ার কিছু নেই এই শিক্ষা প্রদান কেন্দ্রগুলির অনেকেরই আর্থিক সম্পদের মূল্য বহু লক্ষ কোটি টাকা। এই সংস্থাগুলি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নিপুণ প্রয়োগের মাধ্যমে আজ প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে নিজেদের প্রবেশের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এরা নিজেদের বিষয়বস্তুকে সর্বভারতীয় স্তর থেকে প্রচার করে। আগামীদিনে এইভাবে চলতে থাকলে এই ধরনের শিক্ষা প্রদানই মূল ধারা হয়ে উঠবে। যার ফলশ্রুতিতে চীনে চরম পন্থা নিয়ে এদের আটকানোর চেষ্টা হয়েছে।

প্রত্যেক অভিভাবকই ভাবেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বাড়তি সাহায্য দরকার কেননা স্কুলের শিক্ষা পর্যাপ্ত নয়। বিদ্যালয়ের

শিক্ষকরা অনেক দিন থেকেই তাঁদের কাছে যথেষ্ট নয়। অত্যাধুনিক অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রথায় পারদর্শী শিক্ষকই যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন, এই ধারণাটা ইতিমধ্যেই মান্যতা পেয়েছে। অবস্থা এমন জায়গায় এসেছে এই বৈদ্যুতিন পদ্ধতি আজ আর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সীমায় নেই এটিই এখন আশু প্রয়োজন। সকলেই জানেন, আমাদের দেশের রাজস্থানের কোটা ফ্যাক্টরি'র দাপট। আপনি যদি কোটার ব্যবস্থাকে আপনার ফোনের স্ক্রিনে নিয়ে আসেন দেখবেন সেখানে কী পরিমাণ মহামারীর মতো পরিস্থিতি চলছে। আসলে এই দেশব্যাপী বৈদ্যুতিন শিক্ষা গেড়ে বসেই গেছে। স্কুল শেষ হলেই পড়ুয়ারা নানান টিউশন প্রতিষ্ঠানে চলে যায় যাতে তাদের পরীক্ষার নম্বর ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছয়। স্কুল শেষে বিকেল বা সন্ধ্যা অবধি মাঠে খেলা, পার্কে গল্প গুজব আজ অতীত স্মৃতি। বিশ্রামের কোনো প্রশ্ন নেই।

খেলাধুলো, গান বাজনা, নাটক, অন্য শিল্পকলার চর্চা, আবৃত্তি, বিতর্কসভার মতো এমন বহু জিনিস যা ছাত্রজীবনের মূল্যবান অঙ্গ হতে পারে কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষায় কোনো কার্যকরী ভূমিকা নিতে অক্ষম— পড়ুয়াদের জীবন থেকে যেসব ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখবেন ভারতীয় অভিভাবকরা এক ধরনের আশীর্বাদ প্রদানে পারঙ্গম। কিন্তু আদতে নির্দয় এক প্রজাতি। তারা সর্বদা তাদের ছেলে-মেয়েদের জোর করেই এগিয়ে দেবে যাতে তারা তাদের শিশুকালটিকে বিলিয়ে দেয় ওই দুটো বাড়তি নম্বরের কুমতলবে। ওই দুটি নম্বরই হয়তো ভবিষ্যতে নিশ্চিত করবে ছাত্রের জীবন ঠিক কোন খাতে গিয়ে পৌঁছবে। চর্তুদিকে নজর করে দেখুন অধিকাংশ কলেজেই এই ভর্তির মরসুমে cut off মার্ক ১০০ শতাংশ ঠিক করা হয়েছে। আচ্ছা, একবারও ভেবেছেন, যে ছাত্রটি ৯৮ পেয়েছে আর যে ১০০ পেয়েছে উভয়ের মধ্যে গুণগত উৎকর্ষে কী ফারাক আছে। প্রতিযোগিতা থাকা সবসময় ভালো এই যুক্তি এখানে খাটে না। বাস্তবে ছাত্ররা এখন একটা জিনিসের দাসত্ব করছে যার অন্তিম লক্ষ্য মাত্র কয়েকটা নম্বর। ৯৭-এর জায়গায় পদার্থ বিজ্ঞানে ৯৯ পেতে ছেলেটি যে সময় ব্যয় করছে সেই সময় সম্পূর্ণ অন্য কোনো দক্ষতা সে অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারত। একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিকল্প ক্ষেত্রে তার নিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ত। একই সঙ্গে অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ত। কিন্তু প্রথমে বলা বিশেষ ধরনের শিক্ষা নেওয়ার প্রায় উন্মাদ প্রতিযোগিতায় এসব চিন্তার কোনো স্থান নেই। আর এখন বিলিয়ন ডলারের মূলধন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি পেছনে থেকে মদত দিচ্ছে আমরা অলক্ষ্যভাবেই একটি 'টিউশন মহামারীর' পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

দিনরাত একই বিষয়ে শিক্ষা নেওয়ার ফলে পড়ুয়াদের সামাজিক ভারসাম্য হারানোর পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশন অন্য ক্ষতিও করে। তারা সুস্থ প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্রটি কেড়ে নেয়। বড়ো বড়ো জায়গার বিশেষ প্রাইভেট প্রশিক্ষণ কারখানার খরচ বহু লক্ষ টাকা। কতজন ভারতীয় ছাত্র তা নিতে পারে বা নেবার ক্ষমতা ধরে। এর ফলে যারা টিউশন নিতে পারলো না আর যারা পারল লক্ষ্য পুরণের ক্ষেত্রে সক্ষমরাই তো অনায্যভাবে এগিয়ে গেল, কেননা তারা বাড়তি সুলুক সন্ধান পরীক্ষার খুঁটিনাটি জানার সুযোগ পেয়েছে। এই বৈষম্যই কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য?

অবশ্যই আমাদের দেশে অতিকায় টিউশনি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করা সমস্যার সমাধান নয়। সেটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। কেননা এই পথে তো কেবলমাত্র টিউশন সরবরাহকারীকে আক্রমণ করা হবে কিন্তু নিউশনের যে বিশাল চাহিদা তৈরি হয়েছে তার কী হবে? আর চাহিদা থাকলেই ভারতীয় অভিভাবকরা যেখানেই হোক আইনকে যেনতেনপ্রকারেণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাঁদের সন্তানদের বাড়তি দক্ষতা দিতে জান লড়িয়ে দেবেন।

এই চক্র থেকে বেরোবার জন্য আমি কয়েকটি সমাধান সূত্রের কথা ভেবেছি। সেগুলি এরকম :

১। আমাদের সংস্কৃতিগতভাবে একটু পথ বদলানো দরকার। আমাদের সন্তানদের হাঁফ ছাড়ার অবকাশ দিতেই হবে। সত্যি বলছি, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ছাড়া অন্য পেশা আছে। সেটা মানতে হবে। তোমার যদি বাস্তবে কোনো বিষয়ে নিজস্ব উৎকর্ষ বা বিশেষ দক্ষতা থেকে থাকে তাহলে সেই পথেই সাফল্য আসবে।

২। আমাদের আরও কলেজ খুলতে হবে। কেন আমরা আরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে পারব না যেগুলি যোগ্যতায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ হতে পারে? কেন উন্নত প্রযুক্তির ভাইটাল মিডিয়ামে এডটেক শিক্ষা ব্যবস্থার স্টার্টআপগুলি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করছে কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়ে সুনাম তৈরি করতে পারছে না?

৩। এর কারণ হচ্ছে নানাবিধ নিয়মবিধি। কলেজ তৈরির সময় যেগুলি বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কোনো সম্মাননীয় মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু বহু সন্দেহভাজন ব্যক্তি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

৪। ভালো ও যোগ্য মানুষদের উপযুক্ত উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ ও ব্যবস্থা দেওয়া হোক। ভালো জায়গয় জমি দিয়ে বিশ্ব মানের প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অনুদান দেওয়া হোক। cut off marks ও নতুন করে এন্ট্রান্স টেস্ট বন্ধ করা হোক।

৫। টিউশন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করতে না বললেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠার ওপর লাগাম পরানো দরকার। নিশ্চিতভাবেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকে খুব ভালো পরিষেবা দেয়। প্রার্থীকে চাকরির জন্য উপযুক্ত করা, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন পেশার যোগ্য করে তোলা প্রভৃতি। কিন্তু ভারতীয় অভিভাবকরা কেবল এদেরই প্রশ্রয় দিতে চান। কিন্তু তাহলেই সুষম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কারণে এদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি যাতে ছাত্ররা উন্মাদ প্রতিযোগিতা থেকে পরিত্রাণ পায় এবং বিদ্যালয় তার উপযুক্ত মান্যতা পায়।

(লেখক একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক)

ভারতের কমিউনিস্টদের মতো মিথ্যাচারী পৃথিবীতে কম

বুদ্ধদেব গুহ

ভারতীয় কমিউনিস্টরা কথায় কথায় 'সিআইএ-র দালাল' কথাটা ব্যবহার করেন। তোতা পাখিরই মতো। এঁদের মতো মিথ্যাচারী কমিউনিস্ট পৃথিবীর অন্যত্র বোধহয় কমই আছেন। এঁদের সঙ্গে মৌখিক তর্কে কখনই পেরে ওঠা যায় না। মুখ-সর্বস্ব, পুঁথির জ্ঞান-সর্বস্ব এক বিশেষ ধরনের রাজনীতিতে এঁদের মতো পারঙ্গম কম মানুষই আছেন। তাছাড়া সাম্প্রতিক অতীত থেকে শুধু মুখের জোরই নয়, গায়ের জোরও ওঁরা অবাধে প্রয়োগ করছেন।

এঁরা আমেরিকার কট্টর সমালোচক অথচ রাশিয়ার কোনও দোষই এঁরা দেখেন না। কয়েক বছর আগে আফগানিস্তানে রাশিয়া যেভাবে ঢুকেছিল তা আমরা জানি। অবশ্য সব দেশেই মীরজাফর থাকে। এক বা একাধিক ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত লোভ, তাদের গদি পোক্ত করার বাসনায়, বিদেশিদের হাত ধরে নিয়ে আসে। খাল কেটে কুমির আনে। আর তারপর তার বিবেক যখন জাগে তখন তার চৈতন্য হয়, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। তার দেশের মানুষের বুকের রক্ত, তার বাবা এবং ভাইয়ের বন্দিত্বে, বোনের ও স্ত্রীর অসম্মানের যন্ত্রণায় সে তখন পাগলের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি পেতেই হয়। কেউ পায় যাদের বিশ্বাস সে করেছিল তাদের হাতে, আর কেউ পায় তাকে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের হাত থেকে। আফগানিস্তানেরও অনেক বছর আগে পোল্যান্ডে রাশিয়া কী করেছিল তাও আমরা জানি। কিন্তু মনে হয় ভুলে গেছি। প্রকৃত গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে রাশিয়া বাঁচতে দেয়নি কোনও দেশেই। নাৎসী জার্মানির যেমন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল রাশিয়ারও তেমন ক্যাম্প ছিল তো বটেই, এখনও আছে। শুনি, আধুনিক সর্বজ্ঞ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মতো কমিউনিস্টরাও নাকি ঈশ্বরে অথবা ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁরা লৌহ-যবনিকার অন্ধকারে কমিউনিজম্-এ অবিশ্বাসী মানুষদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেন তা তো চরম ধর্মান্ধদের বর্বর ব্যবহারের চেয়েও ভয়াবহ। কমিউনিস্টদের মতো ধর্মান্ধ বোধহয় খুব কমই আছেন। তাঁদের ধর্ম হচ্ছে 'ইজম্'। সেই ইজম-এ অবিশ্বাসী মানুষ মাত্রই তাঁদের কাছে 'কাফির'।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবারেও বামফ্রন্টকে নির্বাচিত করেছেন অনেক আশা নিয়ে। বার বার তিনবার। কেউ ভালোবেসে করেছেন, কেউ করেছেন কোনও বিকল্পর অভাবে। কিন্তু এবারে ভোট পাবার পর ওঁরা যেন বেশ উদ্ধত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। টোটাল কমিউনিজমও স্বৈরাচারের চরম রূপ। তারই পূর্বাভাস কি এটা? মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নির্বাচনের আগে অনেক কথাই বলেছিলেন। রাজীব আর জ্যোতিবাবুর ব্যক্তি-সত্ত্বারই লড়াই হয়েছিল এই নির্বাচনে। কিন্তু কেন্দ্রে রাজীবের আসন টলায়মান হতেই রাশিয়া নির্দেশ পাঠাল সিপিআই ও সিপিএমকে যে রাজীবকে সমর্থন করুন। সঙ্গে সঙ্গেই ওঁদের ভোল পালটে গেল। রাজীবের দলে চলে গেলেন ওঁরা। এই মদতের অর্থ কি এই নয় যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে মদত দিয়ে তাঁরা দুর্নীতিকেই মদত দিচ্ছেন? অথবা এর অর্থ কী এই-ই যে ওঁদের কাছে দেশের ভালোর চেয়ে ওঁদের পার্টির ভালোটাই বড়ো? পার্টির ভালোর জন্যে ওঁরা দেশকে কি বিকিয়েও দিতে রাজি আছেন? তাই যদি হয়, তবে কংগ্রেসকে আর বেশি দোষী করে লাভ কী? আমেরিকাকেই-বা মগজ ধোলাইয়ের অপবাদ দেওয়া কেন? রাশিয়া কি এঁদের মগজ একেবারেই ধুয়ে দিয়েছে? বিদেশি একটি রাষ্ট্রের নির্দেশ মতো কাজ করতে তাঁদের সম্মানে লাগে না? বিবেকেও না? তাঁরাও কি মীরজাফর? কুইসলিং?

ভারতীয় কমিউনিস্টরা অবশ্য দেশাত্মবোধে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অনেকানেক নেতারাও নেহরু পরিবারেরই মানুষদের মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব সব। দেশের কোটি কোটি ন্যাংটো আর বুভুক্ষু মানুষদের কাঁধে চড়ে এঁরা বিদেশের দেওয়া লজ্জাকর সম্মান ঘরে আনেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও তাঁরা নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। দেশের মূলস্রোত থেকে তাঁরা দূরে সরে ছিলেন সেই দুঃখের দিনে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই তাঁরা ক্ষমতা অধিগ্রহণে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অথচ স্বাধীনতা পাওয়ার পেছনে কমিউনিস্টদের বিন্দুমাত্রও অবদান ছিল না। বরং স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী কিছু কিছু কাজ তাঁরা করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, চীন যখন ভারত আক্রমণ করল তখন ওঁরা চীনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তা নিন্দনীয় বলে মনে করেননি। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গের একজন নারী বুদ্ধিজীবী, নাট্যজগতের উৎপল দত্ত একটি পত্রিকাতে চীনকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। আক্রান্ত স্বদেশের যথার্থ প্রতিভূ হিসেবেই বোধহয়! ভারতবর্ষ এখনও রাশিয়া বা চীন হয়ে ওঠেনি বলেই তাঁর গায়ের চামড়া সেদিন অক্ষত ছিল। এইসব বুদ্ধিজীবীদের বোঝা ভারী মুশকিল। মস্কোই যদি ওঁদের মস্তিষ্ক হয় তবে তাঁরা যে দেশদ্রোহী নন তাই-ই বলা যায় কী করে? তাঁদের কাছে 'ইজম্'ই সব, পার্টিই সব। দেশ জাহান্নামে যাক। ক্ষমতার লোভ চিরদিনই এঁদের সুবিধাবাদী ও বিবেকরহিত রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেছে— এই কথাটা এই সংকটের মুহূর্তে ভারতের জনগণের মনে রাখা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের তো বটেই।

আজকের দিনে ভারতের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে জনসমস্যা। যতই উৎপাদন বাড়ুক না কেন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো এই সর্বগ্রাসী জনসংখ্যা সমস্ত উন্নতিই সঙ্গে

সঙ্গে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। কোটি কোটি বুভুক্ষু বস্ত্রহীন মানুষ এবং তাদের কঙ্কাল অনন্তকাল ধরে চেয়ে থাকবে এদেশীয় ভণ্ড নেতাদের মুখের দিকে। যে সমস্যাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত ছিল সেই সমস্যা সম্বন্ধে সকলেই নীরব। কী কেন্দ্র কী রাজ্য। এ নিয়ে জোর করবে কে? ভোটে হাত পড়ে যাবে যে! তার চেয়ে এইভাবেই দেশ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলুক। যত ভোট বাড়বে, যত বেশি মানুষ অশিক্ষিত থাকবে, অভুক্ত থাকবে, রাজনীতিক নেতাদের তো ততই লাভ। চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর ঘুরিয়ে দিয়ে হাতে একখানা দশ কী বিশ টাকার নোট ধরিয়ে দিলেই সহজে যাদের কাছ থেকে পাঁচ বছরের জমিদারির দলিলনামা কিনে নেওয়া যায়, সংখ্যাতে তারা যত বেশি হয় ততই তো মঙ্গল। এই জঞ্জাল, এই পঙ্কের মধ্যে জানোয়ারের মতো দারিদ্র্যসীমার শেষতম প্রান্তরে যত মানুষ ঘেঁটুফুলের মতো ফুটে উঠবে ততই তো রাজনৈতিক নেতাদের পদযুগল ঘেঁটুশোভিত হবে, আরও আরও ভোটের নিরুপায় নৈবেদ্যতে। অভুক্ত, অশক্তরাই কৈশোরে ও যৌবনে ভাড়া খাটবে পিচগলা পথে। ঘর্মাক্ত হয়ে, লাল-নীল-সবুজ সব পতাকা নিয়ে শহরে মিছিল করতে আসবে। পুকার দিয়ে বলবে : 'যুগ যুগ জীও, যুগ যুগ জীও'! কী তামাশা।

বর্তমানে ভারত যে সংকটে পড়েছে এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যেও রাশিয়ার অঙ্গুলি নির্দেশে যে হরকত চলেছে তা দেখে অনেকেরই স্বাভাবিক কারণ ভয় হচ্ছে যে রাজীব গান্ধী আর জ্যোতিবাবুরা মিলে নিজেদের গদি পোক্ত করার জন্যে এই দেশকে আফগানিস্তানেরই মতো রাশিয়ার হাতেই তুলে না দেন। তাই এই মুহূর্তে আমার আপনার আমাদের প্রত্যেকেরই নতুন করে সচেতন হবার সময় এসেছে। মনে রাখবার মুহূর্তে এসেছে যে, এই দেশের মালিক রাজীব গান্ধী যতটুকু, জ্যোতিবাবু যতটুকু, ঠিক ততটুকু আমি ও আপনিও। এদেশ কারও পৈতৃক জমিদারি নয় যে যাকে-তাকে তাঁদের ইচ্ছামতো তাঁরা তা দান করে দেবেন। দান করতে পারেন অবশ্য যদি আপনারা প্রত্যেকে সজাগ এবং সোচ্চার না হন। নিজের জীবিকা, নিজের পরিবার, নিজের সুখ ছাড়াও আরও কিছু কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আপনাদের প্রত্যেকেরই নেওয়া উচিত। আমাদেরই দেশ। এই দেশে সক্রিয় রাজনীতি করেন শতকরা দুজন মানুষ। তাদের মধ্যে দেড়জন মানুষের কাছে রাজনীতিই জীবিকা। দেশকে বা দেশের মানুষকে ভালোবেসে তারা রাজনীতি করেন না। অথচ এই দু' শতাংশ মানুষেরই হাতে আমরা আমাদের দেশ, আমাদের যৌবন, আমাদের বার্ধক্য, আমাদের আদরের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। মাঝে মাঝে চায়ের কাপে তুফান তুলেই আমরা মনে করি কর্তব্য শেষ হলো। সব সময় মনে রাখতে ভুলবেন না যে এই দেশের মালিক আপনিও। পথ-ঘাট, রেলগাড়ি, ট্রাম-বাস, সব কিছুতেই আপনার অংশ আছে। দেশের ভবিষ্যতেও অংশ আছে পুরোপুরিই। দুশো বছর আমরা ব্রিটিশের পরাভূত ছিলাম। এবার হয়তো দু' হাজার বছর অথবা অনন্তকাল ধরে রুশদের পরাভূত হব। 'কলোনিয়াল ব্রিটিশরাজের' ইতিহাসে স্বাধীনতা দেওয়ার উদাহরণ তবু আছে ভুরিভুরি, কিন্তু 'কলোনিয়াল রুশরাজের' ইতিহাসে তেমন উদাহরণ একটিও নেই। আপনার মাতৃভাষা, আপনার গলার গান,

ফ : ২

"আমাদের নিজেদের কথা ভাবলেও লজ্জা হয়। এমন আত্মবিস্মৃত জাত বোধহয় আর নেই। আমরা ইংরেজদের তো বটেই, পারসিক, মোগল, আফগান, তুর্কি ইত্যাদিদের— তা তাঁরা এখানে এসে রাজ্য পত্তনই করুন আর লুটেরা বা ধর্ষণকারী হন, কুষ্ঠি ঠিকুজি মুখস্ত করে রাখি। কিন্তু আমাদের নিজেদের পৌরাণিক কাহিনিগুলি তো বটেই ইতিহাসও জানি না। জানি তো না-ই, উলটে জানতে লজ্জাবোধ করি। আর এই লজ্জা বাঙ্গালিদেরই সবচেয়ে বেশি। ফরাসি দেশের রেনেসাঁ অথবা লেনিন স্ট্যালিনের গুষ্টির ইতিহাস অথবা মাও-জে দংয়ের শরীরগতিক সম্বন্ধে যতখানি খবর আমরা রাখি তার এক কণাও রাখি না শঙ্করাচার্য কিংবা শিবাজীর। শঙ্করাচার্য কে ছিলেন তা আমরা জানি না। রামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দের কথাও তেমন জানি না। যে দুই মহাকাব্যের শিক্ষায় আজও নব্বইভাগ ভারতীয় শিক্ষিত। সেই শিক্ষাতেই তাদের মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ আজও আমাদের চেয়ে অনেকই অন্যরকম। আমরা ইংরেজি জানি, কেবল টিভি দেখি, সিএনএন, বিবিসি। বিজ্ঞাপনের আঠাতে দুচোখ সাঁটা আমাদের। অন্য কিছু দেখতেই ভুলে গেছি। রাম আর হনুমানকে নিয়ে তামাশা করি। সিউডো ইন্টেলেকচুয়াল বিধর্মী চিত্রীর আঁকা বিবসনা সীতা বা সরস্বতীর ছবি দেখে আহ্লাদ করি। আমাদের মহান সাহিত্যিকরা বাংলাদেশে বই বিক্রি অব্যাহত রাখতে গোমাংস ভক্ষণের উপকারিতার গুণগান করেন, আর সেই আমরাই হজরত মহম্মদের কেশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেও সেই দুর্বিনয়ের কারণে যত্রতত্র দাঙ্গা বেঁধে যায়। ভারতীয় হিন্দুরা এক আশ্চর্য প্রজাতি। নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর গভীরে অতি দুষ্প্রাচ্য স্লো লরিস প্রজাতির বাঁদরের মতো। যাদের চলতে ফিরতে 'আঠারো মাস।"

(পর্ণমোচী, বুদ্ধদেব গুহ) (পৃষ্ঠা-৪৮৮/৯৯)

আপনার প্রিয় সাহিত্য, আপনার প্রেমিকা, আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কোনও কিছুর উপরই আপনার কোনো অধিকার থাকবে না যদি রাশিয়া এদেশের মালিক হয়। সে বাঁচা কি বাঁচা হবে? এখনও ভেবে দেখুন।

এই দেশের নেতৃবৃন্দ গত চল্লিশ বছরে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে স্বাধীনতা রাখার যোগ্যতা তাঁদের আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধকে যুদ্ধ বলা যায় না। এর আগে যেসব যুদ্ধ হয়েছে তা নিছকই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। ভারতের যদি দুর্বিনীত ট্রিগার-হ্যাপী আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তবে একেবারেই রাশিয়ার খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে এবারে। কারণ আমেরিকার মদত যে দেশ পাবে ভারত তাকে নিজের ক্ষমতায় রুখতে পারবে না এবং রাশিয়া চাইছেও তাই-ই। আমেরিকার ঘাঁটি হয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা। উত্তর পূর্বে চীন তো বসেই আছে হলুদ মাঞ্চুরিয়ান ভাগের মতো। দার্জিলিং জেলার সঙ্গে নেপালের বিস্তৃত সীমান্তও জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা। চীন যদি আমেরিকার সঙ্গে আঁতাত করে ভারতের বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়েই, তবে ওই দিকেও কী যে ঘটবে তা বলা যায় না। সাদা চামড়ার জাতেরা নিজেদের দেশে যুদ্ধ করার চেয়ে তাদের আধুনিকতম সব সমরাস্ত্র ভারতীয় উপমহাদেশে প্রয়োগ করেই পরখ করে নেবে। রাশিয়া, চীন ও আমেরিকা হয়তো পুরো ভারতবর্ষকেই টুকরো করে দখল নেবে বার্লিন শহরের মতো। 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই, এর নতিজা আমাদের দেখা হয়েছে, এখন হিন্দি রুশী ভাই ভাইয়ের নতিজা কী হয় তাই-ই দেখার। আমেরিকার সঙ্গে এই দেশের সম্পর্ক খারাপ করার মূলে মুখ্যত নেহরু পরিবার, তাঁদের প্রত্যেকের 'আমিত্ব'। চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল তখন রাশিয়া আমাদের কড়ে আঙুলটিও এগিয়ে দেয়নি। বড়ো বড়ো গ্লোবমাস্টার প্লেনে করে অজস্র সমরাস্ত্র পাঠিয়েছিল আমেরিকাই। প্রথম দিকে গম দিয়ে বাঁচিয়েছিল আমেরিকাই আমাদের। যদি আমেরিকা অথবা রাশিয়ার মধ্যে বেছে নিতে হয় তবে অনেকেই আমেরিকাকেই বেছে নেবেন। কারণ সেখানে ফাঁকা বুলির গণতন্ত্র নয়, প্রকৃত গণতন্ত্র আছে। সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাইকের মাইক্রোফোনে মুখ দিয়ে যে কোনও লোক প্রেসিডেন্ট রেগনকে এবং তাঁর নীতিকে নির্দ্বিধায় গালাগালি করতে পারেন। কারণ, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি মামলাতে সে দেশের প্রেসিডেন্টের পদ যায়। জনগণই সে প্রকৃত গণতন্ত্রে দেশের মালিক। ভারতবর্ষে আমেরিকার মতো প্রকৃত গণতন্ত্র থাকলে আজ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের অন্যরকম সম্মান হতো। 'হিরো' হয়ে যেতেন তিনি। রাজীব ও তাঁর তাঁবেদারদের হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হতো। আর ভারতবর্ষ যদি রাশিয়া হতো, হয়তো একদিন হবেও, তখন এমন একটি প্রবন্ধ লেখারও কোনও উপায় থাকবে না। আমার অথবা অন্য কারোরই। আমরা সাধারণ আমেরিকানদের জানি। 'দা কিং ক্যান ডু নো রং' একটি পুরনো কথা। কিন্তু পার্টি ক্যান ডু নো রং--- এই হচ্ছে কমিউনিস্টদের কথা। ক্রেমলিনের কথা। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কথা। খুবই দুঃখের বিষয় সাধারণ রুশদের,আমরা কখনও জানার সুযোগই পাইনি এবং পাইনি লৌহ-যবনিকায় বিশ্বাসী রুশ সরকারের আশ্চর্য মানসিকতার কারণেই। যে যুগে মধ্য-প্রাচ্যের মেয়েরাও বোরখার আড়ালে থাকতে চাইছে না সেই যুগে একটি দেশ লোহার বোরখা পরে থাকবে একথা ভাবাই যায় না। কোনও রুশ নাগরিককে হাসতেও দেখি না। রামগড়ুরের ছানা গোমড়া-মুখো, মাথা-নীচু, খুনি খুনি চেহারার ক্লিষ্ট বোবা কিছু মানুষ আর রাশিয়া অনেকের কাছেই সমার্থক। তাদের কাছ থেকে জানার সুযোগ থাকলে হয়তো অন্যরকম বলতে পারতাম। দোষ এদের নয়। রুশ সরকারি ব্যবস্থারই। তাদের পার্টিসর্বস্বতার। তাই এতো ভয়। যে দেশ নিজের সম্বন্ধে এতরকম গোপনীয়তা ও হীনমন্যতা পোষণ করে তাদের বিশ্বাস করার আগে দশবার ভাবা উচিত।

ভারতবর্ষ আজকের মতো বিপদে বোধহয় কখনও পড়েনি। বাইরের বিপদ এবং ভিতরের বিপদও। শ্রীলঙ্কার গোলমাল ও তাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি এবং এ বাবদে ভারতের লজ্জাকর নিশ্চেষ্টতা, যা সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে রাগী করে তুলেছে, পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার বোমা বানানো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, আফগানিস্তানে রুশ উপস্থিতি যা চিরস্থায়ী হতে চলেছে রুশ ঐতিহ্যানুসারে। পরে তো চীন আছেই। আর ভারতের ভিতরে আমাদের অতি পুরনো বন্ধু শিখেরা বিরক্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াচ্ছে চারদিকে। ভারতের বুকে লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানি চর ও পাকিস্তানকে মদত দিতে বদ্ধপরিকর মানুষ নড়ে চড়ে উঠেছে। দার্জিলিঙে ঘিসিং। তার চেয়েও সবচেয়ে বড়ো কথা কোনদিকে চলেছি আমরা? আবারও কি জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবে? স্বল্পদিনের মধ্যেই? রাজীবের জমিদারির মেয়াদ বাড়াবার জন্যে? ভারত কি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? বিদেশি শক্তির কাছে আমরা কি আবারও পরাধীন হব?

এই সমস্ত দুর্ভাবনার একটিও কিন্তু কষ্টকল্পনা নয়। যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে সত্যি হয়ে উঠতে পারে। এমন সংকটে ভারত সত্যি আর পড়েনি। তাই বলব, আপনি যদি প্রকৃত ভারতবাসী হন, ভারতে বসবাসকারী ভারত শত্রু না হন, যদি আপনি এই দেশকে ভালোবাসেন তবে প্রতিটি মুহূর্ত চোখ কান খোলা রাখুন। আপনার জন্মভূমিকে অতসহজে কারও পদানত হতে দেবেন না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেছেন, 'India was never Conquered from without. She was defected from within, it is the unexemined life that led to our Suffering.' এই কথাক'টি মনে রাখার সময় এসেছে। আপনারা প্রত্যেকেই ঘরের শত্রু বিভীষণ আর মীরজাফরদের ওপরে সর্বক্ষণ চোখ রাখুন।

(১৯৮৭ সালে ২৬, ২৭ মে 'আজকাল' পত্রিকায় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহের দুটি কিস্তিতে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি লেখকের অনুমতি নিয়ে সেই সময়ই লেখাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। সেই পুস্তিকা থেকে দ্বিতীয় কিস্তিটি প্রকাশ করা হলো।)

শেখর সেনগুপ্ত

২৯ আগস্ট, ২০২১, রবিবার, প্রায় মধ্যরাতে চলে গেলেন যে মানুষটি, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা যে খুব নিবিড় ছিল, এরকম দাবি করলে সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু যখনই আমরা মুখোমুখি হয়েছি, তখনই মনে হয়েছে তিনি আমার আপনজনদেরই একজন। খ্যাতির পরিমাপে আমি তাঁর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে, আর বয়সেও তিনি আমার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়ো। অথচ দেখুন, বাক্যালাপ একবার শুরু হয়ে গেলে তার ওপর বিরতি টানবার অবকাশ ছিল কম। আমি তাঁকে কোনও ব্যাপারে খুঁটি হিসেবে ধরতে চাইনি; আর তিনিও আমাকে সার্টিফিকেট দেবার কথা কোনওদিন নিশ্চয় ভাবেননি।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের বিশেষ কামরায় উঠলেই দেখা হতো ঋজুদার সঙ্গে

আজ থেকে প্রায় বছর সাতাশ-আঠাশ আগের কথা। আমি তখন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একজন পদস্থ আধিকারিক। কিছুদিন ব্যাঙ্কের স্টাফ কলেজের ফ্যাকালটি হয়েও ছিলাম। সেই সঙ্গে লেখালেখি। লেখালেখি অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিরিশ অতিক্রম করেছে। প্রায়শ ব্যাঙ্কের কাজেই তখন বর্ধমান থেকে ট্রেন ধরে যেতে হতো বোলপুর ও শান্তিনিকেতনে। বর্ধমান স্টেশনে 'শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস' ট্রেনটি এসে থামলেই লাফিয়ে উঠে পড়তাম একটি নির্দিষ্ট কামরায় এবং প্রায় প্রতিবারই ওই কামরায় আমি দেখা পেয়ে যেতাম আমার ঋজুদাকে। নানা মেহনত স্বীকার করে ঠাঁইও পেয়ে যেতাম তাঁর পাশটিতে। পৃথুল দেহ, মুখে হাসি, সারাটা পথ গল্প আর গল্প, নানা বিষয়ে অভিমতের আদানপ্রদান। গল্পের বিষয় যতটা না সাহিত্য ও সংগীত, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থনীতি। তখন 'বর্তমান' পত্রিকার কর্ণধার বরুণ সেনগুপ্তের অনুরোধে তাঁর দুটি কাগজে বিস্তর অর্থনীতি বিষয়ক লেখা লিখে চলেছি। বুদ্ধদেব গুহ সেই লেখাগুলি নিয়েও কথা বলতেন। চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তো। অর্থনীতি ভালোই বোঝেন। তবে আলোচনায় একসময় চলে আসত আরণ্যক প্রকৃতি। শক্তিমান লেখক নির্ভেজাল প্রকৃতিপ্রেমিক। বলতেন, 'যখন যেখানেই থাকি না কেন, আমার চেতনায় প্রকৃতিই সবচেয়ে সক্রিয়।' সত্যি, একজনকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বুদ্ধদেব গুহর প্রকৃতিপ্রেমই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারে রত।

খুব বেশিদিন তাঁর সঙ্গ আমি পাইনি। এমনকী, কলকাতার বালিগঞ্জে বুদ্ধদেব গুহর নিবাসেও কোনও দিন পা রাখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বাড়িতে তথা পারিবারিক জীবনে বুদ্ধদেব গুহ কেমন মানুষ এই বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে আমাকে অনেকটাই অবহিত করেন আমার সুহৃদ, সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবকুমার বসু। এই লেখা শুরু করবার আগে আমি দেবুকে ফোন করলে তিনি জানান, 'আমি তাঁর বাড়িতে বহুবার গিয়েছি। অমন মিশুক, অতিথিপরায়ণ, সজ্জন, খ্যাতিমান ব্যক্তি এই যুগে বিরল। বিন্দুমাত্র অহমিকা নেই। একবার অনুরোধে একটি টপ্পাও গেয়ে শোনান। কী 'অপূর্ব গলা। এখনও কানে বেজে ওঠে। অনবদ্য অভিজ্ঞতা। একবার কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম,— আজ আমার বড়ো মেয়ের জন্মদিন। ব্যাস! তখনই পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে তিনি একশো টাকার দুটো নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, এই রইল আমার আশীর্বাদ তোমার মেয়ের জন্মদিনে।' এই হলেন ব্যক্তি বুদ্ধদেব গুহ। মনে আসছে সেই অনুষ্ঠানের কথা। স্টেট ব্যাঙ্কের কলকাতা কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চে তখন বড়োসড়ো দায়িত্ব সামলাচ্ছি। স্টাফরা স্থির করেছেন, তাঁরা এক ছুটির দিনে জমিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন। ওঁদের অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না আমি। অত্যন্ত

পাঠকপ্রিয় ব্যস্ত লেখককে গিয়ে সব জানাতে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের অফিসের ঘরোয়া অনুষ্ঠান সেদিন সত্যিকারের অনুপম হয়ে উঠেছিল লেখক-গায়কের ভারতের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গীতিতে। সর্বমোট নয়টি গান ওই আসরে তিনি আমাদের শোনান। কেবল গান নয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গানের বৈশিষ্ট এবং ইতিহাসও ব্যাখ্যা করেন।

আমার একাধিক গ্রন্থের প্রকাশক, 'নির্মল বুক এজেন্সি'র কর্ণধার নির্মল কান্তি সাহা আমাকে বলেছিলেন, 'বইয়ের বাজারে যতই মন্দা আসুক, শংকর আর বুদ্ধদেব গুহর বই বেচেই প্রকাশকরা তাঁদের লাভের কড়ি ঠিক তুলে নিতে পারছেন।'

লেখকরূপে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, গায়ক হিসেবে অসচরাচর প্রতিভার অধিকারী, গায়িকা স্ত্রী ঋতু গুহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, দুই কন্যার নিকট স্নেহান্ধ পিতা,— বুদ্ধদেব গুহকে জানতে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ হবার দরকার মনে হয়নি। তবে তাঁর লেখাগুলিকে পাঠ করেছি নিবিষ্টতার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ 'দেবভাষা' শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক সংস্থায়। সংস্থাটির বর্তমান অবস্থান গড়িয়াহাটের নিকটে ফার্ন রোডে।

আমি তখন দৈনিক 'সুসময়' পত্রিকায় রবিবারের পৃষ্ঠায় প্রায়শ লেখালেখি করি। ওই পত্রিকা অফিস থেকেই প্রকাশিত হতো মাসিক 'শিলাদিত্য' পত্রিকা। শিলাদিত্যের সম্পাদক পান্নালাল ঘোষ আমার বন্ধুস্থানীয়। কাজেই ওই পত্রিকাতেও গল্প ও প্রবন্ধ আমাকে জমা দিয়ে আসতে হতো। সেই সূত্রেই 'দেবভাষা'র দুই নবীন বয়সি সংগঠক কবি দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এবং লেখক সৌরভ দে'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তাঁদেরই বিনীত অনুরোধে ওই সংস্থায় এক সন্ধ্যায় সঙ্গী হয়ে এসেছিলাম তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে--- কবি রমানাথ রায়, লেখক-কবি-চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এবং সর্বোপরি বুদ্ধদেব গুহ। অনেকক্ষণ ধরে আমরা কথা বলেছি, বুদ্ধদেব গুহ একটি গানও গাইলেন। প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। এবং সেটাই আমাদের শেষ বৈঠকী আড্ডা। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের শরীর ভেঙে এলেও বুদ্ধদেব গুহকে তখনও বেশ সজীব, তরতাজা বলে মনে হয়েছে।

সাহিত্যস্রষ্টারূপে বুদ্ধদেব গুহর মহিমা প্রমাণিত হয় তাঁর বইগুলির বিপুল চাহিদায়। তাঁর শিকার কাহিনিগুলি অন্য অর্থে যেন প্রকৃতিরই ময়না তদন্ত। অদ্ভুত সাবলীল গল্পগুলিকে একবার পড়তে শুরু করলে মধ্যপথে উঠে আসাটা কঠিন। প্রকৃতিপ্রেমে লেখক আপ্লুত হলেও রচনা বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগের তোড়ে ভাসমান নয়। কমল কুমার মজুমদারের ন্যায় লেখার ধরনে ব্যাকরণকে অমান্য করেননি। তাঁর 'ঋজুদার গল্প সমগ্র' যখন পড়েছি, মনে হয়েছে লেখাগুলি এক কথায় অনবদ্য। অনন্য শব্দবন্ধন অপেক্ষাকৃত স্বকালের বহু লেখকদের তুলনায় ফলে পাঠকালে একটি পর্বকেও পরিত্যাগ করা যায় না। 'দেবভাষা'তে যখন তাঁর পাশে বসবার আমার শেষ সুযোগ, তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে এক সময় জানিয়ে দিলেন, 'আমি প্রায় অন্ধ হতে চলেছি। দৃষ্টিশক্তি কি এবার পুরোপুরি হারাব?' দৃষ্টিশক্তি তাঁর ক্ষীণ হয়ে আসছিল অনেক বছর আগে থেকেই। তাই তাঁর শেষ দিকের লেখাগুলি তৈরি হয়েছে ব্যতিক্রমী পন্থায়। তিনি মুখে বলে গেছেন; আর একজন তা লিখে গিয়েছেন পাতার পর পাতা। নিজের শারীরিক অক্ষমতাকে কখনও অজুহাত হিসেবে দেখাননি আপন লেখার গুণাগুণ বিচার করতে বসে। মৃত্যুকালে বয়স তাঁর পঁচাশি উত্তীর্ণ। রবিবার, ঊনত্রিশ আগস্ট, ২০২১, মধ্যরাতে চিরনিদ্রায় ডুবে গেলেন। স্থান দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিংহোম। এই করোনাক্রান্তকালে পারিবারিক নজরদারিতে আমি যে গৃহবন্দি, তাই অন্তিম দর্শনে যেতে পারলাম না। মৃত্যুর মাস কয়েক আগে তিনি স্বয়ং কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েও সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এবার আর হৃদয়ঙ্গটিকে সচল রাখতে সক্ষম হননি। প্রায় বছর দশেক আগে শিল্পী স্ত্রী ঋতু গুহ তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন ওপারে। এবার আবার তাঁরা মিলিত হলেন।

পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েও সাহিত্য ও সংগীতকেই তিনি জীবনের চালিকাশক্তিরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পরিধি সীমিত নয় এবং গুণমানেও সেগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকৃতি প্রেম, শিকারের প্রতি রোমহর্ষক আকর্ষণ, ঘটনায় অতি নাটকীয়তা না এনেও পাঠকের অনুভূতিতে চমক সৃষ্টি চরিত্র সৃষ্টিতে মুন্সিয়ানা— এ সকলই প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাঠকদের হৃদয় জয় করবে বলেই আমার প্রত্যয়। তাঁর লেখা 'সীতাগড়ের মানুষ খেকো' যখন আমি পাঠ করি, তখনও আমি মধ্যবয়সে পৌঁছে যাইনি এবং লেখাটিকে খুব উপভোগ করেছি; সাহিত্যজাত গুণাগুণ নিয়ে কোনও সমীক্ষা চালাবার কথা মনেও আসেনি। সেই তাগিদ আসে তাঁর 'হলুদ বসন্ত' উপন্যাসটি পাঠ করবার পর। মনে হলো, একজন প্রকৃত শক্তিমান এবং সচেতন সাহিত্যিকের লেখা পড়ছি। লেখায় আবেগ কম, শব্দ চয়নে মার্জিত হুঁশিয়ারি। পাঠককে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম করে দেবার কৌশল ছিল তাঁর করায়ত্ত। প্রকৃতির সুবাস সর্বত্র। প্রকৃতি তো কেবল বনাঞ্চলে নয়। ব্যস্ত শহরাঞ্চলেও তার অবস্থান অনস্বীকার্য। প্রেমের গল্প রচনাতেও তিনি দক্ষ এবং মৌলিক। লেখক স্বয়ং যে সফল প্রেমিক! সংগীতের পীঠস্থান 'দক্ষিণী'তেই তো পরিচয় প্রতিভাময়ী কণ্ঠশিল্পী ঋতুর সঙ্গে। গভীর প্রেম। পরিণতি বিবাহ। সেই প্রেম ও সোহাগচর্চিত সময়টাই যেন ফিরে এসেছে তাঁর উপন্যাসে 'মাধুকরী'তে। 'খেলা যখন' উপন্যাসটিও পড়ে দেখুন। বুদ্ধদেব গুহকে চেনা যাবে। একজন সত্যিকারের অকপট শিল্পী লেখক। ▯

With Best Compliments from :

A Well Wisher

মাধুকরী শেষ করে কোয়েলের কাছে

হীরক কর

'যার নেই কোনও গতি, সে যায় তীর্থপতি'। এই প্রাচীন কলকাত্তাইয়া প্রবাদটাকে আউড়ে আমার দাদামশাইকে ঋজু ভঙ্গীতে বললেন, 'নাতিকে সেই তীর্থপতিতে ভর্তি করে দিলেন। আমিও যে তীর্থপতি।' তারপর হেসে উঠলেন হো হো করে। তিনি বুদ্ধদেব গুহ।

আসলে আমার দাদামশাই সুধাংশু বিকাশ রায়চৌধুরী ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নলিনী সরকারের পিএ। আজকের এলআইসির ফাউন্ডার মেম্বার। 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'-এর নিয়মিত কলামনিস্ট। ৩১ নম্বর লেক প্লেস আমার মামাবাড়ি। পাশেই রাজা বসন্ত রায় রোডের 'কানীনিকা'তে বুদ্ধদেব গুহদের পৈতৃক বাড়ি। তিনি দাদামশাইয়ের লালা। আমার মা, মাসি, মামাদের তিনি লালাদা। পরবর্তী সময়ে আমারও লালাদা। ৩১, লেক প্লেসে দাদামশাইয়ের বৈঠকখানায় সেই সময় কংগ্রেসি আর সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত। যেখানে অতুল্য ঘোষ, বাণী বসুদের দেখেছি। সেখানেই মাঝে মাঝেই হাজির হতেন লালাদা। তিনি তখন তরুণ চার্টার্ড আকাউন্টেন্ট। সবে বন্দুক ছেড়ে জঙ্গল নিয়ে কলম ধরেছেন। ওর বাবা শচীন্দ্রনাথ গুহ ছিলেন বড়ো চার্টার্ড আকাউন্টেন্ট। পাড়ার সকলের মনাদা। ওদের বড়ো পারিবারিক চার্টার্ড ফার্ম। জ্যোতি বসু এবং তার ভায়রাভাই জয়ন্ত রায় লালাদাদের মক্কেল ছিলেন। দাদামশাই যেহেতু ফিন্যান্সের লোক সেহেতু গুহদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্য ছিল। সেই প্রথম লালাদাকে দেখা। সুঠাম চেহারা, টল ফিগার, বাজখাঁই গলা, মানসিক দৃঢ়তা, আর প্রাণখোলা হাসি। আমি তখন পাঁচ কি ছয়।

আমাদের তীর্থপতি ইনস্টিটিউটের শিশু কিশোরদের খেলাধুলা হতো দেশপ্রিয় পার্কের মাঠে। বিশেষ করে ক্রিকেট আর ফুটবল। বড়ো ম্যাচ হলে তীর্থপতির তিন প্রাক্তনী আসতেন। সেবার মিত্র ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ম্যাচে ওরা তিনজন এলেন— চুনী গোস্বামী, শান্ত মিত্র আর লালাদা। ম্যাচ উদ্বোধন করতে লালাদা ব্যাট ধরলেন। বল হাতে চুনী। আমি সহপাঠী প্রবীরের কাঁধের ওপর হাত রেখে মুগ্ধ চোখে সেই উদ্বোধনী ওভার দেখলাম। তারপর বাবার চাকরি সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে এসে আমি তখন কলেজে। সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চাকরি। ততদিনে আমরা ভাই-বোন লালাদাতে সিক্ত। যা কিছু নিষিদ্ধ, যা কিছু বাঙালি কুণ্ঠাভরে উচ্চারণ করত, সেইসব কিছুকে এমন নরম আবেগে তিনি লিখলেন, হৃদয়ে কাঁপন ধরে গেল। এবং সেটাও প্রাক ইন্টারনেট, প্রাক অর্থনৈতিক উদারীকরণের যুগে। সেই গত শতকের আটের দশকে 'মাধুকরী' সব কিছুকে চুরমার করে দিচ্ছিল। ভালোবাসা আর শরীর বিনিময়ের সব নিয়মকে। বিনোদ ইদুরকারকে তো আমরা সবাই খুন করতে চেয়েছিলাম। আর গাড়ি সুদ্ধ জলে ডুবিয়ে দিতে। রুষার জন্য এইটুকু করতে কিংবা মনে মনে নিজেকে পৃথু ঘোষ ভাবতে কী যে শিহরণ হতো! কুর্চির মতো পৃথুকে অসভ্য বলতে বলতে ভালোবাসায় ডুবে যেতেও নিশ্চয়ই চাইতেন আমার মতো অনেকেই। ভালোবাসা আর শরীর যে 'ম্যারেজ ল'-এর তোয়াক্কা করে না, তাঁর চেনানো জঙ্গলের মতোই আদিম নিয়মে চলে, সেটা বুক ঠুকে শিখে নিয়েছিলাম ঋজু গদ্যে আর জঙ্গল এবং শরীরের অমোঘ বর্ণনায়। ঋজুদা থাকল পরবর্তী প্রজন্মের কিশোরদের জন্য। ঋজু গদ্যে প্রেমের বিবরণ— প্রেমের উচ্চারণ আমাদের সাবালক হতে শেখাচ্ছিল। অর্জমা রায় আর যোজনগন্ধা জোয়ারদার জানিয়ে দিলেন চানঘর থেকেও কমিউনিকেশন চলতে পারে। হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে ভিডিয়ো কলের অনেক অনেক আগে। বাংরিপোসিতে রাত্তির কাটাতে যাওয়া কিংবা কোয়েলের পাড়ে গিয়ে বসে থাকা শুধু চোখ বুজে ফর্সা টকটকে মানুষটির লেখার ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য। প্ল্যাটফর্ম ধরে লম্বা বিনুনি ঝুলিয়ে, তাঁতের শাড়ি পরে কেউ হেঁটে আসছে,

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম— এই প্রত্যাশায় তো ভারতবর্ষের কত স্টেশনে বসে থাকা! তিনি শেখালেন যে, হৃদয় শেষ পর্যন্ত একটু উষ্ণতাই চায়।

সালটা ৮৬ হবে। 'জনমন-জনমত' পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হবে। সম্পাদক ফোনে যোগাযোগ করলেন। বুদ্ধদেব গুহর লেখাটা আমাকেই আনতে হবে। গেলাম তাঁর চার্টার্ড ফার্মের অফিসে। লেখা দিলেন, বললেন, তুমি সুধাংশুবাবুর সেই নাতি। বেশ বড়ো হয়ে গেছ।

আমাদের কৈশোরকে যিনি সাবালকত্বের আবির মাখিয়ে দিয়েছিলেন, আর যৌবনকে দিয়েছিলেন কুণ্ঠাহীন ভালোবাসার স্পর্ধা। আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে। হলঙ বাংলোর সামনে প্রেমে পড়া। প্রচণ্ড বর্ষার এয়ারভিউ হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া মহানন্দার ব্রিজ দেখতে দেখতে প্রথম প্রেমে অবগাহন। এবং কী আশ্চর্য ভালোবাসায়, রোম্যান্টিকতায়, খোলা চুল আর জ্যোৎস্নার রাতকে সাক্ষী রেখে আদরে ভেসে যাওয়া শেখানোর সেই মানুষটি লালাদা।

মাঝে বহু বছর কেটে গেছে। খবর করতে গিয়ে ভারতবর্ষের জঙ্গলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। দেরাদুনের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট, সেন্ট্রাল জু অথরিটি, ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অর্থরিটিতে আমার বিশেষ পরিচিতি ঘটেছে। কিছুটা লালাদার অরণ্য-আকর্ষণে। ইতিমধ্যে ভাগ্নে হয়েছে। ভাই-বোন মিলে নাম রেখেছি 'ঋভু'। সে এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল লিগ্যাল সার্ভিসে। সহদরা বলেছিল, তোর ছেলে হলে নাম রাখিস ঋজু। তা হয়নি। আমার একমাত্র কন্যার নাম 'প্রকৃতি'। সবকিছুর পেছনেই যেন নেপথ্যে লালাদার অমোঘ অনুপ্রেরণা। উনি রাজ্যের বন্যপ্রাণ উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারম্যান। আমি গোরুমারার জঙ্গলে রাইনো সেন্সাসে যাচ্ছি। সুন্দরবনে যাচ্ছি বাঘ গুনতে। ভারতের বনকর্তাদের অনেকেই বন্ধু, ভাই, দাদা। পশ্চিমবঙ্গের দপ্তরের সঙ্গে পেশার সূত্রে জড়িয়ে গেছি। দেশের কোনো জঙ্গলে গেলেই সেখানকার লেটেস্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন।

বন্যপ্রাণ উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠক হতো মহাকরণের রোটান্ডায়। তাঁর মতামতের জন্য মন্ত্রী থেকে বনকর্তারা তটস্থ থাকতেন। বৈঠক থেকে বের হলে আমাদের সঙ্গে আড্ডা। কখনো রাইটার্সের অলিন্দে। কখনও বা নিজেই এসে প্রেস কর্নারে বসতেন। লাজুক আমি দূরে দূরে থাকতাম। ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে ডেকে নিতেন। কুশল জিজ্ঞাসা করতেন।

বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মণ। প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্ট অতনু রাহা। আমরা চলেছি সুন্দরবনের কোর অরণ্যের শেষ প্রান্তে ফরেস্ট ক্যাম্পের উদ্বোধন করতে। উদ্বোধন করলেন। নাম দিলেন বনি ক্যাম্প।

বছর ছয়েক আগের কথা। একদিন সন্ধ্যা-রাতে অফিস থেকে বেরিয়ে প্রেস ক্লাবে গেছি। দেখি ক্লাবের লনে কয়েকজনের সঙ্গে বসে আছেন। সেখানে দেখি আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অংশু চক্রবর্তী। আছে পার্থ মুখোপাধ্যায়। ওকে নিয়ে ক্লাবের চিলতে এসি হলে নিয়ে গেলাম। আবদার, লালাদা নিধুবাবুর টপ্পা শোনাতে হবে। একের পর এক টপ্পা গেয়ে চললেন। মাঝে দু-একটি গুরুদেবের গান। আর কোনো অনুরোধ করতে হলো না। সেদিন ওকে কীসে যেন পেয়ে বসেছিল। যখন ঘোর কাটল তখন রাত দেড়টা। আমরা ওকে গাড়িতে তুলে যখন বাড়ির পথ ধরলাম ঘড়ি বলেছে দু'টো। আজ আফশোস হয়, সেই রাতটা কেন ক্যামেরায় ধরে রাখিনি। একটা বড়ো সম্পদ হতো।

ঋতু গুহর গলায় 'শ্রাবণের ধারার মতো' যে শুনেছে, সেই বুঝবে 'খেলা যখন' উনি কেন লিখেছিলেন। সানি টাওয়ার্সের বারান্দায় বসে বর্ষায় কিংবা শরতের আকাশকে সাক্ষী রেখে উনি যত গান শুনেছেন বা শুনিয়েছেন, তাই হয়তো বাকি জীবনের জন্য মাধুকরী হয়ে থাকবে আমাদের কাছে।

৯২ সালের পর থেকে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে থাকলে উনি এসেছেন জানতে পারলে ওঁর কাছে চলে যেতাম। শ্যামবাটিতে বাজার করতে গেলে ওর 'রবিবার'-এ ঢু মারতাম। 'রবিবার'-এর কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করতাম। উনি আছেন কিনা। থাকলে বাজারটা নামিয়ে রেখে ওর বাড়িতে ছুটতাম। মাঝে মধ্যে আড্ডা মারতে আসতেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেনেরা। ওদের আড্ডায় আমি অবাক শ্রোতা। খাওয়াতে আর খেতে ভালো বাসতেন। রকমারি মাছের পদ। রবিবারে গেলে খেয়ে যাবার জন্য জেদ ধরতেন।

আমি প্রেস ক্লাবের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য হবার পর কাগজে খবর দেখে ফোন করলেন। বললেন, এটা একটা কাজের কাজ হলো। একদিন কোনও অনুষ্ঠান কর্তাদের আমন্ত্রণে প্রেস ক্লাবে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে পাকড়াও করলেন। বললেন, তোমাদের ফিশ ফ্রাইটা খাওয়াও। ওটা খেতেই তো প্রেস ক্লাবে আসা। তাঁর রসিকতার ছোঁয়ায় আমরা হেসে আকুল। বললেন, এখন আর বাচ্চা নয়, লজ্জার কিছু নেই। দুটো ফিশ ফ্রাই খেয়ে বললেন, আর নয়। তারপর একদিন ক্লাবে এসেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ওনার কাছে থাকতে পারিনি। অফিসের কাজে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল।

২০২০ সালে এনজিপি-আলিপুরদুয়ার লাইনে ট্রেনের চাকায় পর পর হাতি কাটা পড়ছিল। এমনকী ট্রেনের ধাক্কায় বাঘ মারা পড়ল। শুরু হলো রেল আর বন দপ্তরের দ্বৈরথ। আমি তখন চ্যানেল হেড। এই নিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা অনুষ্ঠান করলাম। তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্ট অতনু রাহা এলেন। সঙ্গে সুন্দরবনের ফিল্ড ডিরেক্টর বাঘ বিশেষজ্ঞ সুব্রত মুখোপাধ্যায়। লালাদা কথা দিয়েও আসতে পারলেন না। হঠাৎ করেই তাকে চলে যেতে হলো কলকাতার বাইরে। পরে আক্ষেপ করে বললেন, আজকাল চ্যানেলগুলো রাজনৈতিক কচকচানি ছাড়া কিছুই করে না। তুমি তাও বন-জঙ্গল নিয়ে অনুষ্ঠান করলে, আর আমি থাকতে পারলাম না। তাই হয়তো শেষ দিকে আমার চাকরি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কথা হলেই বলতেন, কী করছ এখন? কিন্তু ওঁর লেখায় তখনই জেনে গিয়েছিলাম প্রতিভাকে সবসময় ব্র্যান্ডের শিকলে বেঁধে রাখাটা আসলে মধ্যমেধার পিঠ চুলকানো হয়ে যায়।

এই তো শেষ ডিসেম্বরে স্পোর্টসের মানস চক্রবর্তীরা প্রেস ক্লাবের কাঁচের ঘর ক্যামেলিয়াতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। রাত ন'টা। প্রেস ক্লাবের পথ অন্ধকার। আলো-আঁধারিতে দেখলাম, লালাদার গাড়ি। দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে

বুদ্ধদেব গুহ। সঙ্গে গৌতম মোহন চক্রবর্তী।

নামলেন। খপ করে আমার হাতটা ধরলেন। প্রায় ঘষে ঘষে হাঁটছেন। বুকটা ছাৎ করে উঠল। নিজেই বললেন, গাঁটের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। মানসরা এমন করে ধরল, না এসে পারলাম না। তারওপর তোমাদের প্রেস ক্লাব। না, এসে পারা যায়। ধরে ধরে ক্যামেলিয়া অবধি পৌঁছে দিলাম। বললাম, আপনি ফ্রি হলে আমি এসে ক্লাব অফিসে নিয়ে যাব। কখন চলে গেলেন বুঝতেও পারলাম না। হঠাৎ কেউ বলল উনি চলে গেলেন। পরদিন ফোন করলাম, চলে গেলেন, ডাকলেন না। বললেন, দূর থেকে দেখলাম বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তুমি গল্পে মশগুল, তাই ডাকিনি। আর আজকাল কোথাও গেলেই লোকজন এত ঘিরে ধরে। তোমাদের সঙ্গে গল্প করব উপায় আছে। অথচ, ওটাই আমার ঋজুদার সঙ্গে শেষ দেখা। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত নিয়মিত ছুটে গেছেন ওড়িশায়। কখনও এক বছরেই দু-তিন বার। এই পনেরো বছরে আমাদের শুনিয়েছেন, টুম্বকার ভীমধারা আর পুরনাকোটের পথের কথা। পড়িয়েছেন, বিবিগড়ের চন্দনী, ফুলবনীর ফুলমণির গল্প। লাবঙ্গীর গেণ্ডুলিবনের পূর্ণিমার চাঁদ আর বাঘমুণ্ডার হাতিগির্জা পাহাড়ের কথা। শিকার যেন উপলক্ষ্য এই সব বইতে। প্রকৃতির অন্দর মহলের কিছু আশ্চর্য মানুষের দুর্লভ সাহচর্যের বর্ণনা। সেই বর্ণনার গুণেই তাঁর রচনা আদ্যন্ত সরস ও উপভোগ্য। তাঁর চিত্রিত মানুষদের মধ্যে আছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অগ্রজ ড. কিরণ বসু, কোডারমার যুগলপ্রসাদ, অসমের গৌরীপুরের হাতি বিশেষজ্ঞ প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, ইনকামট্যাক্সের বড়ো কর্তা কেনেল এডওয়ার্ড জনসন, দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের পেশাদার শিকারি রামচন্দ্র দত্ত, ধুবড়ির আবু সাত্তার— একদিনে বহু আত্মীয়কে গুলি করে মারার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। আমার মামাবাড়ি পাড়া রাজা বসন্ত রায় রোডের গোপাল সেন। কাড়ুয়া, সুব্রত চ্যাটার্জি অনেকে।

হাজারীবাগের বন্দুকের দোকানি মহম্মদ নাজিম, তিনিই 'মাধুকরী'র সাবীর মিঞা। এ নিয়ে এক গল্প লালাদা নিজেই বলেছেন। আশির দশকের শুরুতেই মধ্যপ্রদেশ সরকারের ট্যুওরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি কে বাগচী তাঁকে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে পর্যটকের জন্য একটি বই লিখতে অনুরোধ করেন।

তিনি ওভাবে লিখতে রাজি হননি। একদিন বানজারা নদীর তীরে সাফারি লজের কাঁচ ঘেরা সুন্দর 'বার কাম রেস্টুরেন্ট'-এ বাগচী সাহেব ও বনকর্তা পারিহার সাহেবের সঙ্গে লালাদার দেখা হয়। কিছুটা আকস্মিকভাবেই। তারপরেই 'মাধুকরী' উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা। এই উপন্যাসের মাধ্যমে পর্যটকরা মধ্যপ্রদেশ এবং তার অরণ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। আমি মুক্কির কানহা লজে গিয়ে সানজানা সাহেবের বাড়ির কেয়ারটেকার দেবী সিংহের খোঁজ করি। কিন্তু খোঁজ মেলেনি। 'মাধুকরী'র জন্যই অনেকে গিয়ে হাটচান্দ্রা, রাইনা, কিবুরু এবং সান্দুর খোঁজ করেন আসলে এগুলো সবই বুদ্ধদেব গুহর কল্পিত গঞ্জ।

গত এপ্রিলে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে ভর্তি হন। রটে যায় তিনি মারা গেছেন। আমি মধ্যরাত্তিরে লিখে দিয়েও কী মনে করে ডিলিট করি। উদ্বেগে পরদিন সাত সকালে ফোন করি। নিজেই ফোন ধরে, মৃদু কণ্ঠে বললেন, ও, তুমি, আমি বেঁচে আছি।

গত ২৯ আগস্ট বুদ্ধদেব গুহর প্রয়াণের পর প্রচুর মানুষের, প্রচুর স্মৃতিচারণ। সবাইকে দুটো প্রশ্ন, প্রথমত, ২৯ আগস্ট, রবিবার রাত্রি সাড়ে এগারোটায় তিনি মারা গেলেন। সোমবার সকল তাঁবেদার বুদ্ধিজীবীদের কাগজে তাঁর প্রয়াণের খবর হেডলাইন হওয়া উচিত ছিল। মাত্র রাত্রি সাড়ে এগারোটা! হলো না কেন?

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। মধ্যরাত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মারা গেছেন। পরদিন সকালে 'আনন্দবাজার'-এ খবরটা আছে। কিন্তু 'আজকাল ফেল। পরদিন সকালে আজকালে লঙ্কাকাণ্ড। অশোক দাশগুপ্ত ক্ষেপে বোম। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়া গেল। গোটা কাগজ জুড়ে হেমন্ত। অশোকদার হেডিং, 'শরতে হেমন্ত নেই'। তাই আশ্চর্য হলাম, আনন্দবাজারে অপমানিত বুদ্ধদেব গুহর মৃত্যু সংবাদটা সকালে 'আজকাল'-এ পেলাম না। শেষ জীবনে তিনি 'আজকাল' ঘরনার বলেই পরিচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই মানুষটা ভারতবর্ষের বন্যপ্রাণ শিখিয়েছেন। ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে যারা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস হন, গত বিশ বছরে তাদের অনেকেই বুদ্ধদেব গুহর লেখা পড়েই হয়েছেন। আইএফএস-রা যাদের ভয় পান, সেই ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির পরম বন্ধু ছিলেন বুদ্ধদেব গুহ।

'শেরনি'রা শুধু মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র সীমান্তে 'বালাঘাট'-এ জন্মায় না। 'অভর্না'র শুধু অসম ক্যাডারের হয় না। তাঁর লেখা পড়েই এ রাজ্যের মেয়েরা, 'শেরনি' থেকে 'বাঘিনি' হয়। মনে পড়ে, হলং বাংলোর সামনে একটি মেয়ে ঢিপ করে প্রণাম করে বলেছিল, আমি আপনার জন্য ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস হয়েছি। তার প্রায় পাঁচ বছর পরে সেই মেয়ের দাপট আমি দেখেছি। ধূপঝোড়া এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে একবার আমি পিছন দিক দিয়ে গিয়ে গোরুমারার ভিতর বাংলোয় ঢুকে পড়েছিলাম। আমাকে আটকে দিয়ে প্রচণ্ড গালাগালি দিয়েছিলেন। পরে ছেড়ে ছিলেন অবশ্য। আমি তার জন্য আজ ভীষণ গর্বিত। সেই 'শেরনি' এখন আমাদের সিসিএফ সুমিতা ঘটক। আশা করি, প্রিন্সিপ্যাল চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্ট অবশ্যই হবেন। লালাদা আপনি সেটা দেখে যেতে পারলেন না। বলা হলো না মৃগীচামিতে আমাদের 'শবর সহজ পাঠ'-এর কথা।

কিন্তু এটা দেখে যেতে পারলেন, আমাদের অরণ্যে যেমন 'বন্দুক নামিয়ে রাখলে' চাকরি হয় তেমন সে সবকে তোয়াক্কা না করে আমাদের মেয়েরা মেধা দিয়ে লড়াই করে 'ইন্দিরা গান্ধী ফরেস্ট অ্যাকাডেমি' থেকে পাসআউট হয়। যার একটা উদাহরণ দেখলাম এবার দুয়ারসিনিতে। সেই ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এখন প্রভেশনে আছেন। আপনার জন্য 'রায়বাঘিনী'। আপনাকে ফোন করলাম। আপনি অসুস্থ। আজ হিমালয়ের তরাইয়ের বনাঞ্চল থেকে, বিন্ধপর্বতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জঙ্গল রক্ষায় নেমে পড়েছে 'শেরনি'রা। হ্যাঁ, আপনার জন্যই। আপনি বুঝিয়েছিলেন, বনবাসী মেয়েরা 'ঔরত' নয়, 'মা'। না হলে মুক্কিতে পৃথু ঘোষরা বন্ধুর কন্যা বাঁচাতে ছুটে যায়! গুলির লড়াই। সে কথা থাক। মোদ্দা কথা হলো, আপনার লেখাই ভারতবর্ষে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য 'শেরনি'-র।

এই বুদ্ধদেবকে ভালোবাসতেন আরেক বুদ্ধদেব। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। যতদূর মনে পড়ে আমাদের বনবিভাগের লোগোর ছবিটি তারই আঁকা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণ উপদেষ্টা কমিটির প্রধান ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বেনুদা, অর্থাৎ অভিনেতা , সব্যসাচী চক্রবর্তী। ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, সুব্রত পাল চৌধুরী, অতনু রাহা, বাঘ বিশেষজ্ঞ সুব্রত মুখোপাধ্যায়, এদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বনদপ্তরটা সাজিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব গুহ।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর পর অসংখ্য অরণ্য-গ্রন্থ লালাদার ঝুলিতে। যেন জিম করবেট এর উত্তরসূরি। জিম করবেট একসময় শিকার করতেন তারপর বন্দুক ছেড়ে দিয়ে অরণ্য সংরক্ষণের ব্রতী হন। 'বাঘ বাঁচাও' আন্দোলনের প্রথম পুরুষ। বুদ্ধদেব গুহও তাই। অথচ আজ কেওড়াতলা শ্মশানে তাকে গান স্যালুটটা দেওয়া গেল না।

উনি বন্দুক নামিয়ে রাখবেন। বন্দুকের বাটে থুঁতনি রেখে বলবেন, ওই দেখ, মড়ি, পশ্চিমবঙ্গে এখনো রয়েল বেঙ্গল টাইগার চিতল খেয়ে যায়। মড়িটা পড়ে থাকে। বাঘ বাবাজি আসবেন, চলো, জঙ্গল বেঁচে থাক। কিছু থাকুক আর না থাকুক, প্রত্যেক প্রান্তের জঙ্গলে, এখনো পাখিরা গান গায়।

৩০ আগস্ট, সোমবার ভোরে, ডুয়ার্স থেকে বান্দোয়ান, বাদামি খরগোশরা পাহাড় থেকে নামেনি। ময়ূরেরা কেকাধ্বনি দেয়নি। বনমুরগির খোঁজে তেভুয়ারা আর আসেনি। আসেনি পিগমি হগরা। হাতিরা জঙ্গল ভাঙেনি। কেননা তিনি নেই। কিপলিঙের জঙ্গল নিয়ে 'মাধুকরী', পালামৌ নিয়ে 'কোজাগর'। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল নিয়ে? স্বপ্ন দেখা অজস্র তরুণ-তরুণী ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস। আপনি সেই ব্রিটিশ আইনে অত্যাচারিত গোন্দ, কাহার, শবরদের আপন মানুষ। আপনি কি জানেন মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশের জনজাতির মানুষ আপনার জন্য অরন্ধন পালন করেছে।

তাই, আপনার গান স্যালুট-এর দরকার নেই। আপনি বুদ্ধদেব গুহ, জঙ্গলের প্রতীক এবং পরিত্রাতা।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সমাজসেবী)

মহাপুরুষ বালাসাহেব দেওরস

গত ২৬ জুলাই সংখ্যায় স্বস্তিকা পত্রিকায় ‘ সামাজিক সমরসতা ও সেবাকাজের মূর্তপুরুষ বালাসাহেব দেওরস’ নিবন্ধটি পাঠ করে আমারও একটি স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠল। একবার পূজনীয় বালাসাহেব দেওরস কলকাতা থেকে নাগপুর ফিরবেন। সুনীলবরণ মুখার্জিদা আমাদের কয়েকজনকে বললেন সন্ধ্যায় বালাসাহেবজীকে মুম্বাই মেলে উঠিয়ে দিতে হবে। সেইমতো আমরা বেশ কয়েকজন সেদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। ট্রেন ছাড়ার সময় হলে আমরা হাত ধরে চেন করে ভিড়ের মধ্যে তাঁকে নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে নেমে এসে প্লাটফর্মে গল্প করছি। এমন সময় সুনীলদা আমাকে বললেন বালাসাহেবজী তোমাকে ডাকছেন। আমি তো অবাক। সরসঙ্ঘচালকজী আমাকে কেন ডাকছেন! আমি দুরু দুরু বক্ষে ধীর পায়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপর বললেন আমি কোন ক্লাসে পড়াশোনা করছি, বাড়িতে কে কে আছেন। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র জেনে খুব খুশি হলেন এবং আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত জীবন সম্পর্কে আমি চিন্তাভাবনা করছি কি না। আমি নীরব থাকাতে তিনি উত্তর পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, দেখো, নিজের পরিবারের লোক ছাড়া এই পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তারাও তোমার পর নয়। তারা সকলেই তোমার আপনজন। এ ভাবনা এখনও যদি তোমার মনে না এসে থাকে তাহলে আমার অনুরোধ আজ থেকে তুমি এভাবেই ভাবতে শেখ। বলার পর তিনি আবার আমার দিকে তাকিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি ওনার কমপার্টমেন্ট থেকে নেমে এলাম। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেন দৃশ্যের বাইরে চলে গেল কিন্তু আমার মনে হলো তিনি ওই কথাকটি শুধু আমাকেই কেন বললেন। একটু পরেই আমার সংবিৎ ফিরল। আমার মনে পড়ল যখন আমরা হাত ধরাধরি করে চেন করে ওনাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন লোক ভিড়ের মধ্যে আমার হাতে উপর পড়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের সামলাবার জন্য কনুই দিয়ে গুতো মেরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল এই ভেবে যে এই ছোট্টো বিষয়টাও তাঁর নজর এড়ায়নি। আমার মনে হতে লাগল, এত বড়ো সংগঠনের প্রধান, এতবড়ো মানুষ, ওই সামান্য বিষয়টা নিয়েও তিনি কত ভাবছেন। তখন বুঝতে পারলাম যে মহাপুরুষ কাকে বলে। এরপরই আমি ঠিক করে ফেললাম, যে সংগঠনের প্রধান অজ্ঞাতকুলশীল সমস্ত সমানুষকে আপনজন বলে ভাবতে পারেন, সেই সংগঠনেই জীবন সঁপে দেব।

আমার মাস্টার মশাই নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করেছেন, যিনি স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তিনি বলতেন, বড়ো মানুষ তিনিই যাঁর খুবই ছোটো ছোটো বিষয়ও নজর এড়ায় না। হাওড়া স্টেশনের সেদিনের ঘটনা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সেই শিক্ষা আমি সেই মহাপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

—**প্রবীর ঘোষাল,**
করুণাময়ী, সল্টলেক, কলকাতা- ৯১

এগিয়ে চলার আহ্বান

‘হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস্ টুমরো’—মহামতি গোখলেজীর এই আপ্তবাক্য আজ ভারতকে এক কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে— ভারত আর ভারত থাকবে কি না? পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে জনসাধারণের মনঃকষ্ট— দুই হাজার জনেরও অধিক মহিলা অধিবক্তার মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতকে হস্তক্ষেপের আবেদন— দেড় শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তির মহামহিম রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের নিকট আকুল আহ্বান--- মান্যবর রাজ্যপাল মহাশয়ের আর্তের নিকট গমন, সহানুভূতির হাত প্রসারণ এবং সর্বোপরি জনসাধারণের কাতর আবেদন সবই ব্যর্থ। কিছুতেই নির্বাচন পরবর্তী অত্যাচারের মাত্রা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এটা শাসন এবং প্রশাসনের অঙ্গুলি হেলনে হচ্ছে কি না সেটাও বলার মতো কোনো বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী, দেশভক্ত, মোমবাতিওয়ালা, সুশীল সমাজ, পুরস্কার ত্যাগী কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মনে হয় এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তবে এটা তো বিশ্বাস করাও কঠিন যে, যা ঘটছে সবই পূর্বকল্পিত ধারাবাহিক ঘটনা, কেননা গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান অনুসারে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে শাসন, সেবা তো নয়। সংস্কারহীন শাসক ক্ষমতার অহংকারে নিজেকে সর্বশক্তিমান এবং সর্বময় কর্তা ভেবে জনসাধারণকে পদদলিত করে চলে— সেটা না শাসক, না প্রজা কারোর পক্ষে হিতকর হয় না। ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত এরকম অনেক এরকম দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

পুরাকালে ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তাঁর তিন মস্তক বিশিষ্ট ত্রিশিরা নামে এক পুত্র ছিল। ভয়ের কারণে সেই পুত্রকে দেবরাজ ইন্দ্র অন্যায় ভাবে বধ করেন এবং ত্রিশিরাকে বধের কারণে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে সংজ্ঞাহীন ও অচেতনবৎ হয়ে জগৎসীমার প্রান্তে জলের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ ত্যাগ করে চলে গেলে সমস্ত জগৎ অরাজকতায় পরিপূর্ণ হলো, শাসনের অভাবে। তখন সকল দেবতা ও ঋষিগণ ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কেননা শত অনুরোধেও কোনো দেবতা স্বর্গরাজ্যের ভার সামলাতে রাজি ছিলেন না। ফলে সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগণ মর্তের এক অত্যন্ত প্রতাপশালী, তেজস্বী, যশস্বী এবং ধার্মিক রাজা নহুষকে দেবতাদের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সমস্ত দেবতা, দানব, যক্ষ্ম, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব এবং ভূতগণ রাজার সামনে হাজির থাকবেন এবং এঁদের থেকে

ফঃ ৩

তেজ সংগ্রহ করে রাজা বলবান হবেন এই শর্তে নহুষের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হলো।

এই দুর্লভ বর এবং স্বর্গরাজ্য লাভ করে নহুষ যিনি পূর্বে ধর্মপরায়ণ ছিলেন তিনি ভোগী হয়ে উঠলেন। তিনি দেব উদ্যান, নন্দনবন, দেব ক্রীড়াঙ্গনে নানা প্রকার প্রমোদে মত্ত হয়ে উঠলেন। তাতে তাঁর মন দূষিত হয়ে উঠল এবং তাঁর পাপদৃষ্টি দেবরাজের সাধ্বী স্ত্রী ইন্দ্রাণীর উপর পড়ল। সভাসদ্দের বললেন, 'আমি দেবতাদের রাজা, সমস্ত লোকের প্রভু। তাহলে দেবী ইন্দ্রাণী আমার সেবার জন্য কেন উপস্থিত হচ্ছেন না? আজই শচীদেবীকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।' শচীদেবী নহুষের কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাতে নহুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখে দেবতা ও ঋষিগণ রাজাকে অনুরোধ করে বললেন--- 'দেবরাজ, আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আপনার মতো সৎব্যক্তি ক্রুদ্ধ হন না। ইন্দ্রাণী পরস্ত্রী। অতএব তাঁকে ক্ষমা করুন। পরস্ত্রী গমন জনিত পাপ হতে নিজেকে দূরে রাখুন। আপনি রাজা, প্রজাদের ধর্মপূর্বক পালন করা আপনার কর্তব্য।'

ঋষিগণ অনেক বোঝালেন কিন্তু কামাসক্ত হওয়ায় তিনি তাঁদের কোনো কথাই শুনলেন না।

তখন ঋষিরা বুঝলেন, এখন নহুষের বল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋষিরাই তার জন্য দায়ী। এ দায় থেকে মুক্ত হওয়ার দায়ও তাঁদের। তখন ঋষিরা শচীদেবীকে একটি উপায় বললেন, সেই মতো শচীদেবী নহুষের নিকট গিয়ে বললেন, তিনি যেন ঋষিদের দ্বারা পালকিবাহিও হয়ে শচীদেবীর কাছে আসেন, তাহলে তিনি প্রসন্ন হয়ে তার অধীন হবেন। এই কথা শুনে নহুষ বললেন, 'সুন্দরী। তুমি তো এক অপূর্ব কথা বলেছো। এরকম কেউ বোধ হয় কোনোদিন চড়েনি। সপ্তর্ষি এবং মহর্ষিরা আমার পালকি বহন করবেন।' নহুষের তো হুঁশ নেই। যথা সময়ে নহুষ রওনা দিলেন। দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিরা পাপাত্মা নহুষের পালকি বহন করছিলেন। সেই সময় শীঘ্রাতিশীঘ্র যাওয়ার জন্য ঋষিদের সঙ্গে তার বিবাদ হয়। অধর্মে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় তিনি অগস্ত্য ঋষির মস্তকে পদাঘাত করে। তাতেই তার তেজ ও কান্তি নষ্ট হয়। অগস্ত্য ঋষির শাপে নহুষ নরকে পতিত হয়।

মুদির দোকানের সীমানা পেরিয়ে এস ওয়াজেদ আলি সাহেবের সেই 'ট্রাডিশন' আজ রাজ্যময়। যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙছে দাঁতের গোড়া।' তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় শিল নোড়া ফেরতের দায়িত্ব কার?

দায়িত্ব কেবলমাত্র সংস্কারযুক্ত চরিত্রই নিতে পারে। সংস্কারযুক্ত চরিত্রই সংস্কারযুক্ত নাগরিক তৈরি করতে পারে। সংস্কারযুক্ত চরিত্রবান নাগরিক থেকেই সংস্কারযুক্ত চরিত্রবান নেতৃত্ব উঠে আসে। তখনই গড়ে উঠবে সংস্কারযুক্ত চরিত্রবান সমাজ ও রাষ্ট্র। তবেই আমাদের স্বপ্ন সাকার হবে— ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়,— ত্যাগ করেই এগিয়ে চলাই কালের নির্দেশ।

—**তপন কুমার বৈদ্য,**
দমদম, কলকাতা-৭৪।

দলের মধ্যে অন্তর্ঘাত হারের অন্যতম কারণ

এবারের বিধানসভা ২০২১ নির্বাচন ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই। গত পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ আর কাটমানি ও দুর্নীতির জালে জড়িয়ে অতিষ্ঠ। তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এবার রাজ্যে সুশাসন ফিরবে। লোকসভা ভোটে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল ভোট বাক্সে। একসঙ্গে ১৮টি লোকসভার আসন উপহার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যে পরিবর্তন চাই। পশ্চিবঙ্গে বিজেপির সংগঠন গ্রামেগঞ্জে তৈরি হতে শুরু করে। দলে দলে মানুষ এসে শামিল হয়। পুরাতন সিপিএম, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল দলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জায়গায় জায়গায় শুরু হয় আদি বনাম নব্য বিজেপির লড়াই। বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে টিকিট পাওয়া নিয়ে নেতাদের মধ্য মতানৈক্য চরমে পৌঁছায়। অনুভবী ও পুরাতন কার্যকর্তাদের সঙ্গে সেরকম কোনো আলোচনা ছাড়াই টিকিট বণ্টন হয়। ফলে দলের মধ্য কিছু পুরাতন নেতৃত্ব গোপনে ও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। তারা ভোটের প্রচারে তো নামলেনই না উপরন্তু পাড়ায় পাড়ায় একটা বিরোধী বার্তা দিয়ে গেলেন। বিধানসভা ভোটে শালবনী বিধান সভার বিজেপি প্রার্থী রাজীব কুণ্ডুর ইলেকশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে দলের অন্তর্ঘাত ভালো করে প্রতক্ষ্য করেছি। বিডিও অফিস থেকে সুবিধা অ্যাপসের মাধ্যমে প্রোগ্রাম পারমিশন বের করে দেওয়া হচ্ছে। বুথ স্তরের নেতারা তা সফল করতে পারেনি। বাড়ি বাড়ি প্রচার নীচুতলার কর্মীরা সেভাবেই করেইনি। এমনকী মণ্ডল সভাপতি যারা ছিলেন তাদের মধ্যেও গাছাড়া ভাব। দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে বুথে বুথে মিটিং, মিছিল সবকিছুতেই ঘাটতি ছিল। দলীয় নেতৃত্বের ধারণা হয়েছিল যে তারা সহজেই জিতে যাবে। ২০১৯ সালের পর গ্রামে-গ্রামে কিছু উড়ো নেতা তৈরি হয়েছিল যারা মানুষের কাছে না গিয়ে তোলাবাজি ও ভয় দেখানোর রাজনীতি শুরু করেছিলেন। যার ফলে গ্রামের মানুষ বিজেপিকে ভরসা করতে পারেনি। ভোটের সময় দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি সাধারণ ভোটার ভালোভাবে নেয়নি। তারপর গণনা কেন্দ্রেও কিছু কর্মী টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়েছিল শোনা যায়। এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতক নেতা কর্মীদের জন্যই আজ বিজেপি প্রার্থীরা ক্ষমতায় আসতে পারেননি হয়েছে। এখনও ওই সমস্ত নেতা, কর্মীরা তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে চলেছেন।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

With Best Compliments from :

A Well Wisher

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিন

সুমেধা ঘোষ

এখনকার সময়ে সারা পৃথিবীতেই পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চাকরি করতে বেরিয়ে পড়েছেন মেয়েরা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন আর্থিকভাবে স্বাধীন সত্তা তৈরি করে নিতে, সংসারে নিজের আর্থিক অবদান রাখতে। বিশেষ করে যেখানে সংসারের প্রথম পুরুষটি (বাবা-দাদা-স্বামী) সংসার সামলাতে কিছুটা অক্ষম হয়ে পড়েছেন তখন সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মহিলাই বিভিন্ন ধরনের পেশা, কর্মজীবন বেছে নিচ্ছেন।

বিগত কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যেও এই মানসিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তারাও নানা ধরনের পেশা, চাকরিকে বেছে নিচ্ছেন আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য। কিন্তু মহিলাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার তো পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর কাজের জায়গায় এই ভয়ংকর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা তো আরও কঠিন। কারণ কয়েক দশক আগে পর্যন্তও কাজের বাজারে ছিল পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য। পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল পেশাগত প্রতিযোগিতা। তাই, পেশাগত জায়গায় নারীর থাবা চেপে বসবার পর, পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা কেড়ে নেবার পর, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে হেনস্থা বা অশালীন আচরণের প্রবণতার একটা উৎপত্তি বা মানসিক যোগসূত্র আমরা বোধহয় এখান থেকেই খুঁজে পাই। কর্মরতা মহিলাদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ মহিলাই প্রায় কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনওভাবে পুরুষ সহকর্মী বা উর্ধ্বতনের হাতে নিগ্রহের শিকার হতে বাধ্য হয়েছেন। এই ধরনের আচরণের মাত্রা অবশ্যই ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতর হয়। এইসব শারীরিক ব্যক্ত, অব্যক্ত, অবাঞ্ছিত আচরণে শুধুমাত্র মহিলাদেরই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সমগ্র কাজের পরিবেশটাই দূষিত, নোংরা, সহ্যের অযোগ্য হয়ে ওঠে।

নানা গবেষণা-পরীক্ষানিরীক্ষা ও সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে কর্মক্ষেত্রে নিগ্রহ সাধারণত দুই ধরনের হয়। প্রথমটিকে ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় 'কুইড প্রোকুও'। ইংরেজিতে বলা হয় গিভ অ্যান্ড টেক। অর্থাৎ কিছু পাওয়ার জন্যে কিছু দিতে হবে। এক্ষেত্রে একজনকে যৌনতা দিতে হবে অন্যজনকে, বলা উচিত কাজের জায়গায় অনুকূল ব্যবহার, স্বাভাবিক পরিস্থিতি বা কখনও কখনও বাড়তি সুবিধা পাবার জন্যে। এটা সাধারণত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জাতীয় ব্যক্তির দিক থেকে আসে। যার ফলে মহিলাটির পক্ষে সেটা প্রত্যাখান করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ সেরকম পরিস্থিতি তৈরি করলে মহিলাটির চাকরি চলে যাবার ভয় থাকে। চাকরির জায়গায় তাকে সেক্ষেত্রে নানারকম হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়। যার ফলে অবস্থা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় ধরনটি আবার শুধুমাত্র উচ্চ পদাধিকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এর সঙ্গে জড়িত থাকে সমগ্রভাবে এক বিরুদ্ধভাবাপন্ন কর্মপরিবেশ। চাকরির জায়গায় নিগ্রহের শিকার হবার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবং শুধুমাত্র মহিলারই নয়, পুরুষেরাও ছাড় পান না। উর্ধ্বতন মহিলা বা পুরুষ কর্তৃপক্ষের হাতে আজকাল পুরুষ কর্মীরাও বাধ্য হন নিগ্রহের শিকার হতে। তবে মানতেই হবে সেগুলো সংখ্যায় এতই কম যে শুধুমাত্র মহিলাদের ওপর নিগ্রহের ঘটনাগুলোই নজরে পড়ে সবচেয়ে বেশি। এতটা পড়বার পর কেউ যদি ভাবতে শুরু করেন যে এই লেখার বিষয় এবং উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কাজের জায়গাতে পুরুষদের কাজকর্ম ছোটো করে দেখানো এবং তাদের চরিত্রে কালি ছেটানো, তা কিন্তু একেবারেই নয়। মহিলা সহকর্মীদের প্রতি তারা কতটা অসংবেদনশীল সেটা প্রমাণ করা, সেটাও কিন্তু কোনওভাবেই নয়। তবে হ্যাঁ, কিছু পুরুষের দ্বারা কিছু মহিলা কর্মী যে নিগ্রহের শিকার হন সেটা তো সকলেই জানেন। মজার কথা হলো, এসব ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের দ্বারা যে নানারকম আচরণের শিকার হন সেটা প্রকারান্তরে নির্যাতনই, কিন্তু সেই নির্যাতনের বিষয়টি খুবই সামান্য হয়ে থাকে। মূল বিষয়টি হয়ে ওঠে ক্ষমতার খেলা বা ক্ষমতা প্রদর্শনের ব্যাপারে নিজস্ব অহমিকার প্রকাশ সেটাই হয়ে ওঠে সেই নিগ্রহকারী পুরুষের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এমনকী, যেসব সমাজে মহিলাদের আলাদাভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে নীচু চোখে দেখা হয় না, সেখানেও কিন্তু এই ধরনের নিগ্রহের সঙ্গে ক্ষমতার ব্যবহার অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

নির্যাতিতা মহিলা এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ফল খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রমোশনের সুযোগ বা চাকরি হারানোর ক্রমাগত চাপের মুখে মহিলাটি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সায় দিতে বা প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। তার ফলে নিগ্রহের শিকার মহিলা কর্মীটি অন্যান্য সহকর্মীদের চোখে সহজলভ্য বলে গণ্য হতে পারেন। এই ধরনের ক্রমাগত মানসিক চাপ থেকে অনেকরকম মানসিক ও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন— প্রবল স্ট্রেসজনিত উদ্বেগ, অবসাদ, অনিদ্রা, মাথায় যন্ত্রণা, খিদে কম হওয়া, ওজন কমে যাওয়া, আত্মসম্মান বোধ কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেওয়া খুব স্বাভাবিক। ▯

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ক্যান্সার এমন একটি রোগ, যে রোগটি সম্পর্কে মানুষ এখনও জানা ও বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও। আসলে ক্যান্সার সম্পর্কে আমাদের সীমিত জ্ঞানের জন্যই রোগটির নাম শুনলে আমরা আঁতকে উঠি। বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হয়, এর মধ্যে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার মানে ইউটেরাস, ওভারি, পেলভিস অঞ্চলে ক্যান্সার হলে যত দ্রুত রোগ নির্ণয় হবে ততই রোগীর সুস্থতার সম্ভাবনা বেশি। সার্ভিক্স, ইউটেরাসের বাকি অংশ-সহ তলপেটের একাধিক অঞ্চলে মোটকথা স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে যে কোনও জায়গাতেই হতে পারে ক্যান্সার, এগুলিকেই বলা হয় সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার। তবে সব মহিলার সবসময়ে একই ধরনের উপসর্গ থাকে না। ক্যান্সারটি কোথায় হয়েছে ও কতদূর ছড়িয়েছে সেই অনুসারে এর উপসর্গের পার্থক্য হয়।

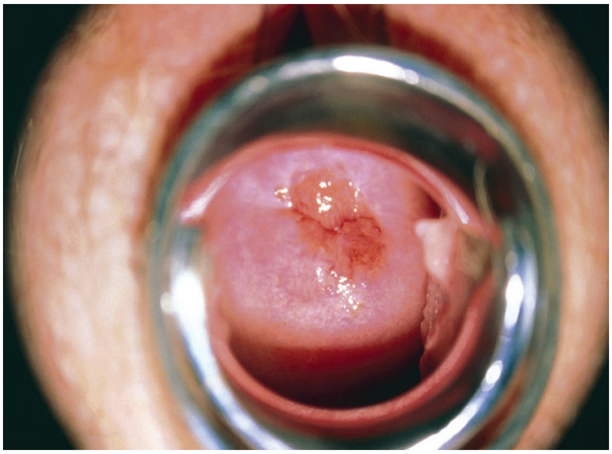

কোন কোন উপসর্গ দেখে সচেতন হবেন : কয়েকটি কমন উপসর্গ দেখে মহিলাদের সচেতন হতে হবে ও এগুলিকে কখনওই অবহেলা করা যাবে না—

অস্বাভাবিক ব্লিডিং : দুটি পিরিয়ডসের মধ্যবর্তী সময়ে পিরিয়ডস হয়ে যাওয়া।

২৩ দিনের কম গ্যাপে পিরিয়ডস : যোনিদ্বার দিয়ে অতিরিক্ত সাদাস্রাব হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, তলপেটে পিরিয়ডসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ক্র্যাম্প ধরার মতো ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

বার বার ইউরিন পাস করার প্রয়োজনীয়তা : মেনোপোজ হয়ে গেলেও যোনিদ্বার থেকে রক্তপাত।

আছে ভ্যাকসিন : বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার মহিলাদের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যাওয়ায় শঙ্কা বেড়েছে চিকিৎসকদের মধ্যে। ইউটেরাসের নীচের অংশকে বলা হয় সার্ভিক্স। এর বাইরের ও ভিতরের কোষগুলি যখন তার চরিত্র বদল করে তখনি আস্তে আস্তে ক্যান্সারাস কোষের দিকে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ হলো হিউম্যান প্যাপিলোমো ভাইরাস সংক্ষেপে এইচপিভি। যৌন সহবাস, অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের ফলে এই ভাইরাস স্ত্রী দেহে ঢুকে পড়ে।

তবে আশার কথা হলো এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে। প্রথমটি নেওয়ার একমাস পরে দ্বিতীয়টি, তার ছয়মাস পরে তৃতীয়টি নিতে হবে। কোনও মেয়ে ঋতুমতী হওয়ার পর থেকেই যত দ্রুত সম্ভব এই ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া উচিত। বিদেশে অনেকদিন ধরেই এই ভ্যাকসিন চলছে। এছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রোগনির্ণয় করা, রেগুলার স্ক্রিনিং, যোনিদ্বার থেকে সোয়াব নিয়ে প্যাপস্মিয়ার টেস্ট করালে ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে কী না বোঝা যায়। প্যাপস্মিয়ার টেস্টের ফলে কোষগুলির কোনওরকম ক্যান্সারাস পরিবর্তন হচ্ছে কী না সে বিষয়ে আগাম আন্দাজ করা সম্ভব।

কমন কয়েকটি সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার :

১। এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার : এই ক্যান্সারকে ইউটেরাইন ক্যান্সারও বলে। ইউটেরাস থেকেই এই ক্যান্সার শুরু হয়। অধিকাংশ সময়েই এটি প্রথমাবস্থায় ধরা পড়ে, কেননা এর প্রধান উপসর্গ হলো অস্বাভাবিক রক্তপাত, যা দেখলে যে কেউ সচেতন হয়ে যাবেন। এর প্রধান চিকিৎসা হলো অপারেশন করে ইউটেরাস বাদ দিয়ে দেওয়া (হিস্টেরেক্টোমি)। এই ধরনের ক্যান্সারের যদি পারিবারিক ইতিহাস থাকে, তাহলে যাতে রোগটি না হয়, সেজন্য আগে থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। মেনোপোজের পরেও এই ক্যান্সার হতে পারে। সেক্ষেত্রে হরমোন থেরাপি করে আগে থেকে সুস্থ থাকার প্রচেষ্টা করা হয়। তবে সবার আগে কমাতে হবে ওবেসিটিকে। ওবেসিটি এই ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।

২। ওভারিয়ান ক্যান্সার : ওভারি থেকে এই ক্যান্সারের সূত্রপাত। পেলভিক অঞ্চল কিংবা পেটে ছড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওভারিয়ান ক্যান্সার ধরা পড়ে না। যত দেরিতে রোগ ধরা পড়বে, ততই এর চিকিৎসা করা অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে। জন্মনিয়ন্ত্রক পিল মানে হরমোনজনিত বিভিন্ন পিল খেয়ে এই ক্যান্সার রোধের চেষ্টা করা হয়। তবে কারোর যদি ওভারিয়ান ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস থাকে, তাহলে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

৩। ভ্যাজাইনাল ক্যান্সার : ভ্যাজাইনা বা যোনিদ্বারের ক্যান্সারও সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের অন্তর্গত। যত দ্রুত রোগ নির্ণয় হবে, ততই রোগীকে সেরা চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় না। অনেক সময়ে যোনিদ্বারের ভিতর দিয়েও ছড়িয়ে পড়ে ক্যান্সারটি। পেলভিক পরীক্ষা, প্যাপস্মিয়ার টেস্ট করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। বয়স ৩৫-এর বেশি হলে অবশ্যই এইচপিভি ভ্যাকসিন নিতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : যাদের বংশগতির ধারায় ক্যান্সারের ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। আমার পিতা ডাঃ প্রকাশ মল্লিক একজন প্রবীণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তিনি ৩৮ বছর নানান জটিল রোগের পাশাপাশি ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন। তাঁকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ বলা হয়। ক্যান্সারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগী দীর্ঘদিন যন্ত্রণাহীন সাবলীল ভাবে বেঁচে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যে সমস্ত রোগী সমস্ত ধরনের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন তারা হোমিওপ্যাথিতে সুস্থ হয়েছেন।

উনি জানতেন, আমি রাসবিহারীর কাছাকাছি থাকি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এতদিন পরেও সে কথা উনি মনে রেখেছেন দেখে। তবুও আমি সেদিন তাঁর গাড়িতে উঠিনি।

আমাকে আর লুকোচুরি খেলতে হবে না

সিদ্ধার্থ সিংহ

ধর্মতলার অম্বর রেঁস্তোরা কাম বারের ওপরে ছিল বুদ্ধদেব গুহর অফিস। আমি তখন আনন্দবাজারে ঢুকেছি মাত্র কয়েকদিন হয়েছে। সবে পুজোসংখ্যার কাজ শুরু হয়েছে। রমাপদ চৌধুরী আমাকে বললেন, যান তো। বুদ্ধদেব গুহর লেখাটা হয়ে গেছে। চট করে একটু নিয়ে আসুন।

গিয়ে দেখি ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছেন। আমি বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই বলাতে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বললেন, কী ব্যাপার বলুন...

আমি বললাম, ওনাকে বলুন আমাকে রমাপদ চৌধুরী পাঠিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার পুজোসংখ্যার লেখাটা নিতে এসেছি।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ভিতরে যান।

আমি ভিতরে ঢুকেই তাঁকে দেখে বললাম, ও আপনি?

আসলে আমি বেশ কয়েকবার ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কান্তেকবি দিনেশ দাসের বড়ো ছেলে শান্তনু দাসের সঙ্গে। শান্তনুদা তখন ঘরোয়া পত্রিকা দেখতেন। প্রসাদ পত্রিকা দেখতেন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই দুটি পত্রিকাই ছিল বাংলাভাষার প্রথম সারির চটকদার পত্রিকা।

মনে আছে, শান্তনুদার সঙ্গে তাঁর একবার বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তাঁর একটি

লেখা প্রসঙ্গে শান্তনুদা বলেছিলেন, কোনও বাঘ কি আট ফুট লম্বা হতে পারে?

তিনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পারে। অবশ্যই পারে। কোনও বাঘ যদি গাছের গুড়িতে সামনের পা দুটো আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিমায় টান টান করে মেলে দেয়, তা হলে আট ফুট কেন? তার থেকে বেশিও হতে পারে।

আমি বুঝতে পারলাম, তার মানে ইনিই বুদ্ধদেব গুহ!

আমি বললাম, আমাকে রমাপদবাবু পাঠিয়েছেন, মানে রমাপদ চৌধুরী।

সেদিন পুজোসংখ্যার লেখা দেওয়ার সময় তিনি আমাকে একটি শেফার্ড পেন উপহার দিয়েছিলেন।

পরে জেনেছি কলমের প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ দুর্বলতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামিদামি কোম্পানির দামি দামি কলম সংগ্রহ করতেন। সেই কলম রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে দু'জন লোক ছিল এবং প্রথম কারও সঙ্গে আলাপ হলেই তিনি তাকে কলম উপহার দিতেন।

'মাধুকরী' ছাড়াও তাঁর পাঠকপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'কোয়েলের কাছে', 'বাবলি', 'কোজাগর', 'একটু উষ্ণতার জন্য', 'কুমুদিনী', 'খেলা যখন', 'জঙ্গলমহল', 'নগ্ন নির্জন', 'অববাহিকা', 'পরদেশিয়া', 'সবিনয় নিবেদন (পত্রোপন্যাস)', 'আলোকঝারি', 'চানঘরে গান'-সহ অজস্র উপন্যাস। যেগুলোর পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র রঙের ছটা, স্নিগ্ধ প্রকৃতি। জঙ্গলের বুনো গন্ধ। শিকারের উন্মাদনা। রোম্যান্টিসিজম মানেই বুদ্ধদেব গুহ।

তাঁর দুটো রচনা 'বাবা হওয়া' এবং 'স্বামী হওয়া'-র ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে পুরস্কারবিজয়ী বাংলা চলচ্চিত্র 'ডিকশনারি'।

শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। তাঁর তৈরি চরিত্র ঋজুদা ও তার সহযোগী রুদ্রকে নিয়ে লিখেছেন 'ঋজুদা' সিরিজ। এই দুটি চরিত্র শুধু ছোটোদেরই নয়, মন জয় করে নিয়েছে বড়োদেরও। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ঋজুদা যেন তাঁর মতোই পরিব্রাজক।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আসা এই লেখক অরণ্যকে যেমন তাঁর লেখার এক মূল আধার হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তেমনই তাঁর লেখাগুলোর পটভূমিও ছিল গহিন অরণ্য। তাঁর কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে একাধিক টিভি অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র। ১৯৭৭ সালে তিনি আনন্দ পুরস্কার পান।

আমরা তাঁকে লালাদা বলে ডাকতাম। সেই লালাদা শুধু একজন লেখকই ছিলেন না, ছিলেন একজন সংগীতশিল্পীও। যে কোনও দক্ষ গায়কের মতোই টপ্পা গাইতেন। ছবি আঁকতেন। উপন্যাস ছাড়াও লিখেছেন কবিতা, গল্প ও মজাদার কাহিনি।

আপাদমস্তক উদ্দাম প্রেমিক এই লেখক কিশোর-কিশোরীদের মন জয় করা প্রেমের উপন্যাস রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি। তার মধ্যে 'হলুদ বসন্ত' অন্যতম। বাংলা কথাসাহিত্যে এমন রোমান্টিসিজমের সংযোজন খুব কমই আছে।

উনি আনন্দবাজার পত্রিকায় ঠিক সময়ে লেখাটা দিলেও ফাইনাল প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে তাঁর এতটাই খুঁতখুঁতানি ছিল যে, প্রুফটা নেওয়ার সময় কবে দেবেন দিনক্ষণ বলে দিলেও, কতবার যে ঘোরাতেন তার কোনও ঠিক ছিল না।

পর পর বেশ কয়েক দিন ঘোরার পরে আমি এতটাই বিরক্ত হয়েছিলাম যে, আমি তাঁর সামনেই অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। উনিও নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। বলেছিলেন, আমি রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো লিখি না। আমি টিকে থাকার লেখা লিখি। তাই লেখা ছাপা হওয়ার আগে আমি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে প্রুফটা দেখি। তাই আমার সময় লাগে, বুঝেছ?

জানতাম, উনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো। কলকাতার একজন নামকরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। যে অফিসে বসে আছি, সেটা তাঁরই ফার্ম।

তবুও সেদিন আমার মাথায় যে কী ভূত চেপেছিল কে জানে, দুম করে বলে ফেলেছিলাম, লেখার জন্য আপনি কার কাছে কতদিন টিকে থাকবেন তা আমি জানি না। তবে আপনি আমার কাছে টিকে থাকবেন ওই কলম আর কলম ঠিক করা লোক দুটির জন্য। বলেই, গটমট করে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

অফিসে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম, উনি আমার নামে কমপ্লেন করেছেন রমাপদ চৌধুরীর কাছে।

না, তার পর আমি আর কোনও দিন তাঁর ওই অফিসে যাইনি।

ওই ঘটনার প্রায় আঠাশ-ঊনত্রিশ বছর পরে যখন সুচিত্রা ভট্টাচার্য মারা গেলেন, তখন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। লিখতে বলা হয়েছিল বুদ্ধদেব গুহকেও। যেহেতু ওই সংকলনটির কাজের সঙ্গে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলাম, তাই সেই লেখাটি আনার জন্য সুচিত্রাদির ভাই কুণালদা আমাকে বলেছিলেন, ওঁর বাড়ি থেকে লেখাটি সংগ্রহ করে আনার জন্য।

প্রখ্যাত ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারের নামে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে, গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপোর উলটো দিকে যে আবাসন, আমি সেই সানি টাওয়ারে গিয়েছিলাম। কিন্তু উপরে উঠিনি। নীচের সিকিউরিটি গার্ডকে বলেছিলাম, লেখাটা এনে দেওয়ার জন্য। উনি এনে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তা বলে কি আর কোনও দিনই তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়নি? হয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে কী একটা অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। বেরোবার সময় তাঁর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। পাশ কাটিয়ে যখন যাচ্ছি, উনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, কোন দিকে যাবে? আমি রাসবিহারী হয়ে যাব।

উনি জানতেন, আমি রাসবিহারীর কাছাকাছি থাকি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এতদিন পরেও সে কথা উনি মনে রেখেছেন দেখে। তবুও আমি সেদিন তাঁর গাড়িতে উঠিনি।

জানি, এখন আমি চাইলেও তাঁর গাড়িতে আমার আর ওঠা হবে না। তাঁর পাশে বসে যাওয়া হবে না কোনও গন্তব্যে। গ্র্যান্ড হোটেলের আনন্দ পুরস্কারের অনুষ্ঠানে গেলেও আমাকে আর লুকোচুরি খেলতে হবে না।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সম্পাদক)

ভাবিনা বেন প্যাটেল

ভারতকে গর্বিত করেছেন প্যারালিম্পিয়ানরা

নিলয় সামান্ত

ইতিহাস গড়লেন ভাবিনাবেন পটেল। টোকিয়োতে আয়োজিত প্যারালিম্পিক্সের টেবিল টেনিসে রুপো জিতলেন তিনি। এবারের প্যারালিম্পিক্সে এটাই ভারতের প্রথম পদক জয়। ফাইনালে চীনের ঝৌ ইংয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হেরে গেলেন ভাবিনাবেন। খেলার ফল ০-৩ (৭-১১, ৫-১১, ৬-১১)। প্রথম গেমে ৭-১১ ব্যবধানে হেরে যান ভাবিনা। চীনের ঝৌ ইং প্রথম গেম থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করেন। তাঁর ব্যাকহ্যান্ডের দাপটে দিশেহারা হয়ে যান ভাবিনাবেন। কোনও উত্তর ছিল না তাঁর কাছে। একের পর এক পয়েন্ট হারাতে থাকেন তিনি।

দ্বিতীয় গেমেও শুরু থেকেই দাপট ছিল ঝৌ ইংয়ের। ৫-১১ ব্যবধানে সেই গেম হেরে যান ভাবিনাবেন। বিশ্বের এক নম্বর ঝৌয়ের কাছে সোনা জয় তখন সময়ের অপেক্ষা। একের পর এক চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা ভাবিনাবেন শেষ বাধাটা টপকাতে পারলেন না। ৬-১১ ব্যবধানে শেষ গেম হেরে গেলেন তিনি। প্যারালিম্পিক্সে এর আগে কোনওদিন টেবিল টেনিসে পদক জেতেনি ভারত। সেই পরিসংখ্যান উলটে দিলেন ভাবিনাবেন পটেল।

ভারতে অলিম্পিক্স ক্রীড়াবিদরা যতটা পরিচিতি পান, প্যারালিম্পিয়ানরা তার সিকিভাগও পান না। ফেন্সার ভবানী দেবীর নাম যতটা পরিচিত, রুপো জয়ী ভাবিনাবেন তার ধারে কাছে নেই। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্যারা প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেও এতদিন ভাবিনাবেন ছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে অজানাই। ভারতের হয়ে ৩০টিরও বেশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। জিতেছেন বহু পদক। তবে প্যারালিম্পিক্সে সাফল্যই তাঁকে দেশব্যাপী পরিচিতি এনে দিল।

গুজরাটে ভাডনগরে মেহমানা জেলার সুন্ধিয়া গ্রামে ১৯৮৬-র ৬ নভেম্বর জন্ম ভাবিনাবেনের। মাত্র এক বছর বয়সেই পোলিয়োয় আক্রান্ত হন তিনি। শরীরের নীচের অংশ ক্রমশ অবশ হয়ে যেতে থাকে।

মধ্যবিত্ত পরিবার হওয়ায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য ছিল না বাবা-মায়ের। তবু ভাবিনার বাবা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। পাঁচ জনের পরিবারের পুরো ভার তাঁর কাঁধে থাকলেও ভাবিনাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে চিকিৎসা করাতে। কিন্তু সেই অস্ত্রোপচার কাজে লাগেনি। কারণ যে রিহ্যাব করতে দেওয়া হয়েছিল, তা ঠিক মতো অনুসরণ করেননি ভাবিনা।

ফলে খুব ছোটো থেকেই হুইলচেয়ার তার সব সময়ের সঙ্গী। সুন্ধিয়া গ্রামে আর পাঁচটা ছেলে-মেয়ের সঙ্গে সাধারণ স্কুলেই পড়তেন ভাবিনা। ২০০৪-এ তাঁর বাবা আমেদাবাদের ব্লাইন্ড পিপলস অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে কম্পিউটার পড়ার পাশাপাশি স্নাতক হওয়া লক্ষ্য ছিল ভাবিনার। কিন্তু এখান থেকেই তাঁর জীবন হঠাৎ ঘুরে যায়। ব্লাইন্ড পিপলস অ্যাসোসিয়েশনে পড়ার সময় লালা যোশীর সঙ্গে পরিচিতি হয় ভাবিনার। লালাই ভাবিনাকে পরামর্শ দেন ফিটনেস বজায় রাখতে টেবিল টেনিস খেলতে। শেখার ইচ্ছে ছোটো থেকেই ছিল। ফলে খুব অল্প সময়ে খেলা আয়ত্ত করে নেন ভাবিনা। তিন বছর কঠোর পরিশ্রমের পর ২০০৭-এ বেঙ্গালুরুতে প্যারা টেবিল টেনিসে জাতীয় খেতাব জেতেন। ২০০৯-এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অভিষেক হয় তাঁর। তবে সাফল্য পেতে আরও দু' বছর লেগেছিল। ২০১১-য় তাইল্যান্ড ওপেন প্যারা টেবিল টেনিসে রুপো জেতেন তিনি।

সেই শুরু। দু' বছর পরে এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় রুপো জেতেন। সেটাও ছিল প্যারা টেবিল টেনিসে ভারতের প্রথম রুপো। এরপর জর্ডান, তাইওয়ান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, স্লোভেনিয়া, তাইল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস ও মিশরে পদক জেতেন।

নিষাদ কুমার

কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সোনার পদক আসছিলই না। অবশেষে ২০১৯-এ ব্যাংককে প্যারা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের জীবনের প্রথম সোনা পান। বয়স সঙ্গ দিলে পরের প্যারালিম্পিক্সেও অংশ নিতে চান ভাবিনাবেন। তবে আপাতত টোকিয়োর সাফল্য উপভোগ করতে চান তিনি।

চীনা খেলোয়াড়দের হারানো অনেকেই কার্যত অসম্ভব বলে মনে করেন। সেটাকেও সম্ভব করে দেখিয়েছেন ভাবিনা। ম্যাচের পর বলেছিলেন, 'চীনা খেলোয়াড়কে হারানো অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করেন। সেটা করতে পেরে আমি গর্বিত। প্রমাণ করে দিয়েছি যে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। যদি মনের ইচ্ছা থাকে তাহলে যে কোনও কিছুই হাসিল করা সম্ভব।'

টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে হাই জাম্পে জোড়া পদক। রুপো জিতলেন মারিয়াপ্পন। ব্রোঞ্জ পেলেন শরদ কুমার। এ বারের প্যারালিম্পিক্সে ইতিমধ্যেই তেরোটি পদক ভারতের। গতবারের সোনাজয়ী মারিয়াপ্পনকে এবার রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। বৃষ্টির মধ্যেই এই ইভেন্টে খেলতে হয় প্রতিযোগীদের। আমেরিকার সোনাজয়ী স্যাম গ্রিউয়ের সঙ্গে লড়াই চলে মারিয়াপ্পনের। দু'জনেই ১.৮৬ মিটার দূরত্ব পার করেন। সোনার পদকের জন্য ১.৮৮ মিটার দূরত্ব পার করতে হতো। কিন্তু তা পারেননি মারিয়াপ্পন। সেই দূরত্ব লাফিয়ে সোনা জিতে নেন গ্রিউ।

শরদ ব্রোঞ্জ জেতেন ১.৮৩ মিটার লাফিয়ে। রিয়ো প্যারালিম্পিক্সে মারিয়াপ্পন সোনা জিতেছিলেন ১.৮৯ মিটার দূরত্ব লাফিয়ে। টোকিয়োতে সেটা পারলেন না তিনি। রিয়োতে রুপো জিতেছিলেন গ্রিউ। টোকিয়োতে এসে সোনা জিতলেন তিনি।

জীবন শুরু করেছিলেন কুস্তিতে। লক্ষ্য ছিল খেলার মাধ্যমে ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়া। হরিয়ানার সনিপতের এক আখড়ায় অনুশীলন সেরে বাড়ি ফিরছিলেন বাইক চালিয়ে। সেই সময় পিছন থেকে ট্রাক্টরের ধাক্কায় পড়ে যান সুমিত অন্তিল। টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে সোনাজয়ীর পায়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই ট্র্যাক্টর। চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেনায় যোগ দেওয়ার স্বপ্ন। প্যারালিম্পিক্সে সোনা সেই স্বপ্ন ভুলিয়েছে। এখন সুমিতের কাছে নতুন স্বপ্ন, ২০২৪ সালে প্যারালিম্পিক্সের পাশাপাশি অলিম্পিক্সেও অংশ নেওয়া।

সেনায় যোগ দিতে না পারলেও তখন খেলা চালিয়ে যান সুমিত। কুস্তিতে আর না পারলেও শিখতে শুরু করেন জ্যাভলিন থ্রো। এক সাক্ষাৎকারে সুমিত বলেন, 'আমার বাঁ পা থাকলে কুস্তিগির হতাম। খেলার মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। অনেক সরকারি চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই জন্য। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা

আমার জীবনটাই পালটে দিল।'

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নীরজ চোপড়ার সোনা জয় ভারতের কাছে জ্যাভলিনকে পরিচিত করে তুলেছে অনেক বেশি। সেই নীরজের সঙ্গে গ্রাঁ প্রিঁ-তে অংশ নিয়েছিলেন সুমিত। সেখানে নীরজ সোনা জেতেন, সুমিত শেষ করেন সাত নম্বরে। আবার নীরজের সঙ্গে নামার স্বপ্ন দেখছেন সুমিত। প্যারালিম্পিক্সে ৬৮.৫৫ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুঁড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সুমিত বলেন, 'বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিততে চেয়েছিলাম। সেটাই করেছি। তবে এখানেই থামছি না। আরও অনেকটা পথ যাওয়া বাকি। আপাতত বাড়ি ফিরে ১৫-২০ দিন বিশ্রাম নেব। চিকিৎসকরা তেমনটাই পরামর্শ দিয়েছেন। বিশ্রাম নিয়ে, সুস্থ হয়ে ফের মাঠে নামতে চাই। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ আমার পরবর্তী লক্ষ্য। ২০২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিক্স ও প্যারালিম্পিক্স, দুটোতেই যদি অংশ নিই তাতেও অবাক হবেন না। ৭৫ থেকে ৮০ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছোড়ার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করতে সেটা নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে। আমি সেটা করার চেষ্টা অবশ্যই করব। নিজেকে সেই ভাবে তৈরি করব।'

২০১৯ সালে দুবাইয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে রুপো জিতে টোকিয়োর টিকিক নিশ্চিত করেছিলেন সুমিত। সেই প্রতিযোগিতার শেষে নীরজের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সুমিত বলেন, 'নীরজকে ধন্যবাদ আমাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। ওর প্রত্যেকটা কথা আমার মনে আছে। নীরজ বলেছিল আমার ক্ষমতা আছে টোকিয়োতে পদক জেতার। ও বলেছিল, 'ভাই, তুমি নিশ্চয়ই পদক জিতবে।'

নীরজকে সব সময় পাশে পেয়েছেন সুমিত। তিনি বলেন, 'আমার যখন প্রয়োজন হয়েছে, নীরজ আমাকে সাহায্য করেছে। সব সময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি ছিল ও। খুব ভালো মানুষ নীরজ।' সোমবার বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন ২৩ বছরের সুমিত। নীরজ টুইট করে লেখেন, 'দারুণ পারফরম্যান্স সুমিত ভাই। গর্বিত তোমার

সুমিত অন্তিল

জন্য।' এক সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নীরজ বলেন, 'আমরা দু'জনেই সোনা জিতেছি। এটা আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েছে। দেশে ফিরলে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।' একাধিক খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা অলিম্পিক্স ও প্যারালিম্পিক্স, দুই প্রতিযোগিতাতেই অংশ নিয়েছেন। শারীরিক দুর্বলতা তাঁদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে অলিম্পিক্স ও প্যারালিম্পিক্স দুই প্রতিযোগিতাই খেলে পদক জেতার রেকর্ড আছে একমাত্র পল সেকারেসের। হাঙ্গেরির এই ফেন্সার ১৯৮৮ সালে অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। বাস দুর্ঘটনায় কোমরের নীচের অংশ অবশ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। এর পর প্যারালিম্পিক্সে অংশ নিয়ে ছ'টি পদক (তিনটি সোনা এবং তিনটি ব্রোঞ্জ) জেতেন পল। প্যারালিম্পিক্সে সোনা জেতা হয়ে গিয়েছে সুমিতের। অলিম্পিক্সে অংশ নিয়েও কি পদক জিততে পারবেন তিনি?

ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতের সিংহরাজ আধানা। ফাইনালে ২১৬.৮ পয়েন্ট পেয়ে পদক জেতেন তিনি। তবে একই ইভেন্টে হতাশ করেছেন মণীশ নারওয়াল। যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে প্রথম হলেও ফাইনালে সাত নম্বরে শেষ করেন তিনি। ১৩৫.৮ পয়েন্ট পেয়েছেন মণীশ। অন্যদিকে যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে ছয় নম্বরে থাকা সিংহরাজ ভারতকে পদক এনে দিলেন।

ফাইনালের শুরু থেকেই ভালো ছন্দে ছিলেন ভারতের শুটার। প্রথমেই ৯৫ পয়েন্ট পেলেও পরের শটেই ৯৭ মারেন সিংহরাজ। শেষ শটে ফের একবার ৯৭ মেরে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। এক হাতে পিস্তল ধরে শুট করেন সিংহরাজ। এসএইচ ১ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের এই প্যারালিম্পিয়ান।

সাল ২০১১। মুক্তি পেল অভিনব বিন্দ্রার আত্মজীবনী 'এ শট অ্যাট হিস্ট্রি'। পদক জয়ের খিদে, লড়াই এবং সাফল্য তুলে ধরলেন ভারতীয় শুটার। সেই বইয়ে তিনি অস্বীকার করলেন শুধুমাত্র সেরা প্রশিক্ষণ বা কোচেরাই সাফল্য এনে দেওয়ার রাস্তা তৈরি করে দিতে পারে। তাঁর লড়াইয়ের সেই কাহিনি অনুপ্রেরণা দিল গোটা দেশকে, অবনী লেখারাকেও।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্যারালিম্পিক্সে সোনা জয়। অলিম্পিক্সে কোনও ভারতীয়

ফঃ ৪

মহিলার সোনার পদক নেই। প্যারালিম্পিক্সে সেই কীর্তি গড়লেন অবনী। শুধু সোনা জয় নয়, সেই সঙ্গে বিশ্বরেকর্ডও গড়েছেন তিনি। ২০১২ সাল থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবনী বুঝিয়ে দিলেন ইচ্ছে থাকলে কোনও বাধাই কঠিন নয়। খেলাধুলার সঙ্গে পড়াশোনাতেও প্রথম স্থানেই থাকতেন অবনী। সোনা জয়ের পর এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমার মনের মধ্যে কী চলছে সেটা বলে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছে আমি অনেক উঁচুতে বসে আছি। ব্যাখ্যা করতে পারব না এই মুহূর্তটা।' জয়ের পর উত্তেজিত থাকা অবনী খেলার সময় কীভাবে শান্ত রেখেছিলেন নিজেকে? তিনি বলেন, 'নিজেকে বার বার বলছিলাম একটা করে শট নিয়ে ভাবব। একেকটা শট ধরে এগোচ্ছিলাম। কত স্কোর হলো, পদক পাব কী না, এসব চিন্তাই করিনি তখন। আমার লক্ষ্য ছিল যে শটটা মারছি সেটা ঠিক মারা।'

দেশকে পদক এনে দিতে পেরেই খুশি অবনী। তাঁর আশা আরও পদক পাবে ভারত। ছ'বছর আগে প্রথম রাইফেল হাতে নেন অবনী। তাঁর বয়স তখন ১৩ বছর। অবনী বলেন, 'রাইফেল হাতে নিলে মনে হয় যেন ঘোরে রয়েছি। বুঝতে পারি কিছু একটা যোগ রয়েছে আমার সঙ্গে রাইফেলের। লক্ষ্য ঠিক রেখে ধারাবাহিক ভাবে শুট করে যেতে ঘরে রয়েছি। বুঝতে পারি কিছু একটা যোগ রয়েছে আমার সঙ্গে রাইফেলের। লক্ষ্য ঠিক রেখে ধারাবারিক ভাবে শুট করে যেতে হয়, এটাই করতে ভালো লাগে আমার।'

২০১২ সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় শরীরের নীচের অংশ অকেজো হয়ে যায় অবনীর। সেই সময় তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। ওখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত তাঁর জীবন। কিন্তু অবনীর বাবা সেটা হতে দেননি। মেয়েকে উদ্বুদ্ধ করেন খেলার জন্য। ভর্তি করে দেন তিরন্দাজিতে। তবে তির-ধনুক নয়, বন্দুক হাতেই নিজেকে খুঁজে পান অবনী। রাজস্তানের কলেজে আইন নিয়ে পড়াশোনা করা মেয়েটি সেই বন্দুক হাতেই ভারতকে সম্মান এনে দিলেন টোকিয়োতে।

২০১৭ সাল থেকে পদক জয় শুরু করেছেন অবনী। যুব বিশ্বকাপে রুপো জেতেন। সেই বছর বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। ২০১৯ সালে ক্রোয়েশিয়াতে রুপো জেতেন। একই ফল ২০২১ সালেও। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করেন অবনী। সরকারের তরফেও সাহায্য পান। ২০১৭ সাল থেকে তাঁকে যুক্ত করা হয় টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিমে (টপস)। ১২টি আন্তর্জাতিক বিভাগে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান অবনী। তাঁর বাড়িতে অনুশীলনের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বসাতেও আর্থিক সাহায্য করে সরকার।

ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জয়ের পর অবনী নামবেন মিক্সড ইভেন্টে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের সেই ইভেন্টে তাঁর সঙ্গী হবেন সিদ্ধার্থবাবু ও দীপক। বুধবার সেই ইভেন্টে খেলতে নামবেন তাঁরা। ৫০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত এবং দলগত ইভেন্টেও অংশ নেবেন অবনী।

একবার, দু'বার নয়। টোকিয়োয় সোনা জয়ের পথে পাঁচ-পাঁচ বার নিজের বিশ্বরেকর্ডের চেয়ে বেশি দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন তিনি। তার পরেও সুমিত অন্তিল মনে করেন, সেরাটা এখনও দেখাতে পারেননি। জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন তিনি। তার পরেও সুমিত অন্তিল মনে করেন, সেরাটা এখনও দেখাতে পারেননি! জ্যাভলিনে (পুরুষদের এফ ৬৪ বিভাগ) সুমিতের কীর্তি দেখতে দেখতে রিয়ো প্যারালিম্পিক্সে রুপোজয়ী দীপা মালিক উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন, 'কী কাণ্ড ঘটাচ্ছে সুমিত। এ তো অসম্ভবকে সম্ভব করে দিচ্ছে।' শেষ পর্যন্ত ৬৮.৫৫ মিটার ছুঁড়ে জ্যাভলিন সোনা পেলেন ২৩ বছর বয়সি সুমিত। টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্স থেকে যা ভারতের দ্বিতীয় সোনা। যার পরে সুমিতের মন্তব্য, 'এটা আমার সেরা থ্রো নয়। তবে বিশ্বরেকর্ড করতে পেরে অবশ্যই আমি খুশি।'

সুমিত যে বিভাগে টোকিয়োয় নেমেছেন, তাকে বলা হয় 'এফ ৬৪'। এই বিভাগে তাঁরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন, যাঁদের একটা পা অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে দাঁড়াতে পারেন। হরিয়ানার সোনপতের এই তরুণ আগেই বিশ্বরেকর্ডের (৬২.৮৮) মালিক ছিলেন। এ দিন পাঁচ বার নিজের রেকর্ডের চেয়ে বেশি দূরত্বে জ্যাভলিন ছোড়েন তিনি। তাঁর এ দিনের 'থ্রো'গুলো যথাক্রমে, ৬৬.৯৫, ৬৮.০৮, ৬৫.২৭, ৬৬.৭১ এবং ৬৮.৫৫ মিটার।

দুর্ঘটনার পরে কীভাবে ঘুরে গিয়েছিল তাঁর জীবন? সুমিতের কথায়, 'পা বাদ যাওয়ার পরে আমার জীবনটাই বদলে যায়। ২০১৫ সালে আমি স্টেডিয়ামে যেতাম শুধু সবার সঙ্গে দেখা করতে। তখন প্যারা-অ্যাথলিটদের দেখা পাই। ওরা আমাকে বলেছিল, 'তোমার উচ্চতা ভালো, শরীরের গঠন ভালো। কে বলতে পারে, তুমি পরের প্যারালিম্পিক্সে যাবে না?' তখন কে ভেবেছিল, আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাব!'

সেটাই হলেন সুমিত। কী রকম অনুভূতি হচ্ছে? বিশ্বসেরার কথায়, 'এটা আমার প্রথম প্যারালিম্পিক্স ছিল। সত্যি বলতে কী, একটু চাপে ছিলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই খুব ভালো মানের। আমি চেয়েছিলাম, ৭০ মিটারের উপরে ছুড়তে। আমার মন হয়, ৭৫ মিটারের উপরেও ছুড়তে পারব। এটা আমার সেরা থ্রো নয়।'

আরও কতটা দূরত্বে ছুড়তে পারার ক্ষমতা রাখেন তিনি? সুমিতের জবাব, 'প্রস্তুতিতে আমি অনেকবারই ৭১ মিটার, ৭২ মিটার ছুড়েছি। জানি না, প্রতিযোগিতায় কী হলো।' একটা শপথ কিন্তু করছেন নীরজ চোপড়ার পরে বিশ্বমঞ্চ থেকে জ্যাভলিনে ভারতকে সোনা এনে দেওয়া এই তরুণ। 'ভবিষ্যতে কিন্তু আমি আরও বেশি দূরে ছুড়ব, 'বলছেন নতুন নায়ক।

জ্যাভলিনে জোড়া পদক জয় ভারতের। টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে রুপো জিতলেন দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। সেই ইভেন্টে ব্রোঞ্জও ভারতের। সুন্দর সিংহ গুরজার ব্রোঞ্জ এনে দিলেন ভারতকে। জীবনের সেরা থ্রোটি করেছিলেন দেবেন্দ্র। ৬৪.৩৫ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছোড়েন তিনি। গত বারের প্যারালিম্পিক্সে সোনাজয়ী দেবেন্দ্র। নিজের

সেরাটা দিয়েও সোনা জিততে পারলেন না। রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাঁকে। প্যারালিম্পিক্সে তৃতীয় পদক জয় দেবেন্দ্রর। নরেন্দ্র মোদী টুইট করে লেখেন, ‘দারুণ পারফরম্যান্স দেবেন্দ্রর। আমাদের অন্যতম অভিজ্ঞ প্যারালিম্পিয়ান রুপোর পদক জিতেছেন। দেবেন্দ্র বার বার ভারতকে গর্বিত করেছে। শুভেচ্ছা তাঁকে। আগামীদিনের জন্যেও শুভেচ্ছা।’

ব্রোঞ্জজয়ী সুন্দর জ্যাভলিন ছোড়েন ৬৪.০১ মিটার দূরে। তিনি এই মরসুমে নিজের সেরা থ্রোটি করেছেন। ২০১৫ সালে একটি দুর্ঘটনায় বাঁহাত হারান সুন্দর। ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন তিনি।

তাঁর উদ্দেশে টুইট করে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘সুন্দরের ব্রোঞ্জ জয়ে ভারত আপ্লুত। দারুণ সাহস দেখাল সুন্দর। শুভেচ্ছা জানাই সুন্দরকে।’

এই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন শ্রীলঙ্কার দীনেশ প্রিয়ান হেরাথ। তিনি ৬৭.৭৯ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছোড়েন। বিশ্ব রেকর্ড গড়েন দীনেশ। কিছুদিন আগে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে জ্যাভলিনে সোনা জিতেছিলেন নীরজ চোপড়া। এবার প্যারালিম্পিক্সেও জ্যাভলিনে পদক জিতল ভারত। যোগেশ কাঠুনিয়ার রুপো জয়। টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্য চলছেই। শুটিংয়ে সোনা জয়ের পরেই রুপো এল ডিসকাস থ্রোয়ে। ৪৪.৩৮ মিটার ছুড়ে রুপো পেলেন যোগেশ।

প্রথমবার প্যারালিম্পিক্সে অংশ নিয়েই পদক পেলেন যোগেশ। ২৪ বছরের যোগেশ নয়াদিল্লির কিরোরিমল কলেজের ছাত্র। আট বছর বয়স থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। যোগেশের বাবা সেনায় কর্মরত। তাঁর কাছ থেকেই মানসিক জোর পেয়েছেন যোগেশ। লড়াই করার সেই শক্তিই পদক এনে দিল তাঁকে। নরেন্দ্র মোদী টুইট করে লেখেন, ‘দুর্দান্ত পারফরম্যান্স যোগেশ কাঠুরিয়ার। রুপো নিয়ে আসছেন তিনি। ওঁর সাফল্য অন্যদের অনুপ্রেরণা দেবে। শুভেচ্ছা যোগেশকে। ভবিষ্যতের জন্য আরও সাফল্য কামনা করি।’ অনুরাগ ঠাকুর টুইট করে

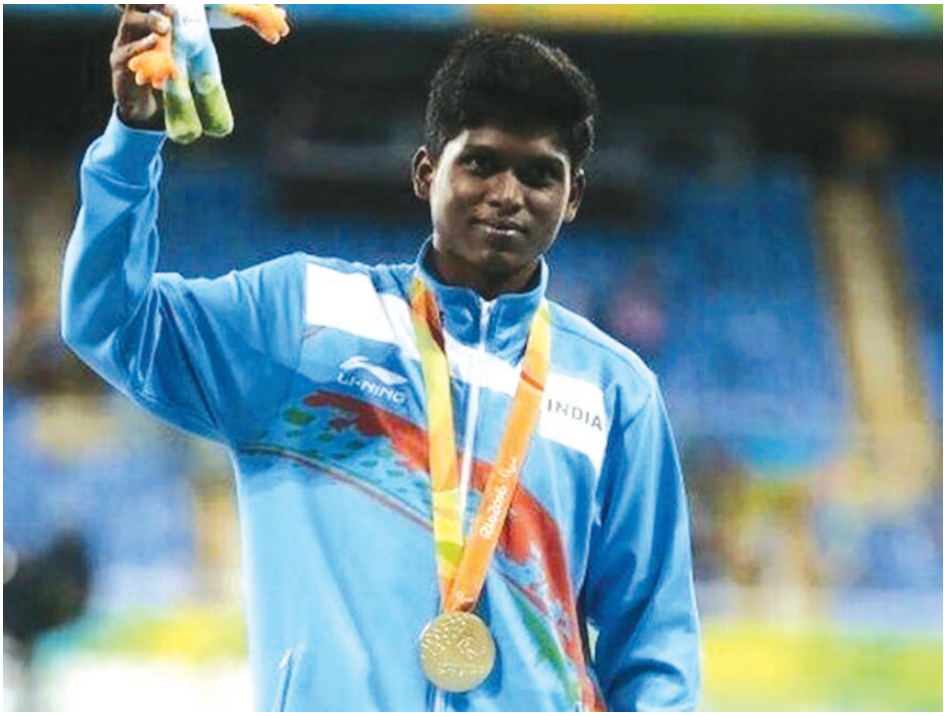

মারিয়াপ্পন থাঙ্গাভেলু

লেখেন, ‘প্রথম প্যারালিম্পিক্সে অংশ নিয়েই রুপো জিতল যোগেশ। ভারতের প্যারালিম্পিয়ানরা আমাদের গর্বিত করছে।’

যোগেশের ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ব্রাজিলের ক্লডিনি বাতিস্তা ডস স্যান্টস। গত বারও সোনা জিতেছিলেন তিনি। ৪৫.৫৯ মিটার দূরে ডিসকাস ছোড়েন তিনি। ২০১৯ বিশ্ব প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন যোগেশ। সেই সাফল্যই প্যারালিম্পিক্সে জায়গা করে দিয়েছিল তাঁকে।

টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে দ্বিতীয় পদক ভারতের। হাই জ্যাম্পে রুপো জিতলেন নিষাদ কুমার। দেশকে রুপো এনে দেওয়াই শুধু নয়, এশিয়ান রেকর্ডও গড়েছেন নিষাদ। ২.০৬ মিটার হাই জ্যাম্প দিয়ে টি ৪৭ ইভেন্টে এই রেকর্ড গড়েন তিনি। ভারতের আরও এক প্যারালিম্পিয়ান রাম পাল শেষ করেন পাঁচ নম্বরে। নিষাদের সাফল্যের কথা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লিখেছেন, ‘টোকিয়ো থেকে ফের এল আনন্দের খবর। নিষাদ কুমার টি ৪৭ হাইজাম্পে রুপো জিতেছে। অভিনন্দন নিষাদকে। ও দক্ষ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একজন ক্রীড়াবিদ।’

প্রথম চেষ্টাতেই ২.০২ মিটার লাফিয়েছিলেন নিষাদ। আর তখনই তাঁর পদক নিশ্চিত হয়। এরপর দু’বারের চেষ্টায় ২.০৬ মিটার লাফ দিতেই রুপো নিশ্চিত করে ফেলেন ভারতের এই প্যারালিম্পিান। ব্যক্তিগত বিভাগে তিরন্দাজ হরবিন্দর সিংহ ব্রোঞ্জ এনে দিলেন ভারতকে। প্যারালিম্পিক্সে তিরন্দাজিতে এর আগে কোনও পদক আসেনি ভারতে। শুট অফে দক্ষিণ কিন সু-কে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন হরবিন্দর। ব্রোঞ্জ ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে জেতেন হরবিন্দর। পাঁচ সেটের ম্যাচে শুরু থেকেই সমানে সমানে লড়াই চলতে থাকে কিম মিন ও হরবিন্দরের মধ্যে। শুট অফে যায় খেলা। শুট অফের নিয়ম অনুসারে দুজনেই একটি একটি করে তির ছুড়তে পারবেন। প্রথম শুটে যদি দুজনেই সমান পয়েন্ট পান তবেই হবে দ্বিতীয় শুট। এক্ষেত্রে যদিও প্রথম শুটেই ফয়সালা হয়ে যায় চ্যাচের। প্রথম তির ছুড়ে ৮ পয়েন্ট পান কিম মিন। এরপর হরবিন্দার ১০ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নেন। এই নিয়ে প্যারালিম্পিক্সে ১৩টি পদক জিতল ভারত।

বার্নপুরে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত বিচার বর্গ

গত ২৯ ও ২৯ আগস্ট পশ্চিম বর্ধমান জেলার বার্নপুরে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত বিচার বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে ৩৫ জন কাযকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বর্গে সমসাময়িক পরিস্থিতি, পরিবেশ-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই বিচার বর্গ আন্তর্জালিক মাধ্যমে সারা রাজ্যে সম্প্রচারিত হয়। আন্তর্জালিক মাধ্যমে রাজ্যের সহস্রাধিক কার্যকর্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বর্গে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ড. ধনপতরাম আগরওয়াল, অখিল ভারতীয় সংঘর্ষবাহিনী প্রমুখ অন্নদাশঙ্কর পাণিগ্রাহী, অখিল ভারতীয় সহ-সংঘর্ষ প্রমুখ বন্দেশঙ্করজী। এছাড়া ইসকোর যুগ্ম অধিকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বর্গাধিকারী ছিলেন ইসকোর উপ মহাপ্রবন্ধক রবীন্দ্রনাথ শেঠ। বর্গে তাঁকে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সহ বিচার প্রমুখের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

মেদিনীপুরে ‘ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান’ কার্যক্রম

গত ২৮ আগস্ট মেদিনীপুর শহরে কালেক্টরেট কম্পাউন্ডে নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে সকাল ৯টায় ‘ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান’ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক (উন্নয়ন) শৌভিক ব্যানার্জি এবং স্বাগত ভাষণ রাখেন যুব কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর স্বাতী রায়। উভয়েই বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে যোগাসন ও প্রাণায়ামের উপযোগিতার বিষয়ে বিশদ বক্তব্য রাখেন। দেশের

অখণ্ডতা ও আত্মনির্ভরতার শপথবাক্য পাঠ করানো হয় সবাইকে। প্রশিক্ষক নবনীতা মিশ্র বিভিন্ন যোগাসনের অভ্যাস করান এবং যোগের নিয়মাবলী ও উপকারিতার উল্লেখ করেন। শেষে সবাই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রমেশ প্রামাণিক।

গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র সেবাকাজ

করোনা মহামারীর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে খড়্গপুর আইআইটি ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সেবা সংস্থাটি বিভিন্নভাবে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে। ২০২০-র এপ্রিল মাসে তারা দু’হাজার পরিবারকে ঘরে ঘরে গিয়ে এক সপ্তাহের রেশন প্রদান করে। এছাড়া তিনজন সহৃদয় ব্যক্তির দান করা ৫০০০ মাস্ক ৭টি গ্রামের গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে। পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য সংস্থা তাদের কয়েকটি ক্যাব স্থানীয় পুলিসকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করে। মে মাসে সংস্থা ‘ ওয়ান ডোনেশান— ওয়ান ফ্যামিলি— ওয়ান মাস্থ’-এর জন্য অর্থ সংগ্রহে

নামে। তাতে ১০ লক্ষেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ হয়। তার দ্বারা ৪৫০ টি গরিব পরিবারকে ১ মাসের ভোজন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে অমফান পীড়িত কিছু পরিবারকেও দেওয়া হয়। জুন মাসে ফিডিং ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে ৭০০ বনবাসী পরিবারে ভোজন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ২০২১-এর জুন মাসে একটি আন্তর্রাষ্ট্রীয় সংস্থার সঙ্গে মিলিত ভাবে ১০০ করোনা পীড়িত পরিবারে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ২০২০ সালের ২১ মে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সেবাকাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জগন্নাথ থেকে মহাকবি কালিদাস

ড: অশোক কুমার দাস

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস। ইতিহাসের পাতা থেকে আজ আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি। প্রচলিত কিংবদন্তী সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছিলেন অসীম গুণের অধিকারী যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর অসীম গুণের জন্য মহারাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সভার পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে ছিলেন।

৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানে বিহার রাজ্যের মধুবনী জেলায় উচ্চপীঠ গ্রামে ভগবতী মন্দিরের পাশে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে তার নাম ছিল জগন্নাথ। বাবা-মা আদর করে ডাকতেন কালো বলে। গুরুদেব জ্ঞানার্জনের পর নাম দেন কালিদাস। পিতৃদেব বিশ্বম্বর ছিলেন দরিদ্র সৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দেব মন্দিরে পূজোপার্বণ বেদ বেদান্ত পাঠ করে ঘুরে বেড়াতেন। অতি অল্প বয়সে কালিদাসের মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ ঘটে। মাতুলালয়ে বড়ো হতে থাকেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য মঠ-মন্দিরে ঘুরে বেড়াতেন, লেখাপড়ার কোনও সুযোগ ঘটেনি।

মহাকবির বিবাহিত জীবন : উচ্চপীঠ থেকে পাঁচ ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে দামোদরপুর একটি গ্রাম। এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে বিশাল সরোবর। এই সরোবরে উত্তর পশ্চিম কোণে দুর্গাস্থান, এখানেই ছিল রাজা মহাদেব রাজের রাজবাড়ি। এই মহাদেব রাজের দ্বিতীয়া স্ত্রীর একমাত্র কন্যা বিদ্যাবতী বা বিদ্যোৎতমা। এই বিদ্যোৎতমার সঙ্গে পণ্ডিতদের চক্রান্তে মূর্খ কালিদাসের বিবাহ হয় ।

রাজকন্যা বিদ্যোৎতমার পরিচয় : ৩৭৯ খ্রিস্টাব্দে পরমা সুন্দরী বিদ্যোৎতমার জন্ম বিহারে, মধুবনী জেলায় দামোদরপুর গ্রামে। বাল্যকালে নাম ছিল বিদ্যোৎতমা। এই বিদ্যোৎতমা ছিল অপূর্ব সুন্দরী ও সুগায়িকা, যেন মা সরস্বতী। অসীম জ্ঞানের অধিকারিণী। তাই পণ্ডিতরা ডাকতেন কমলা বা সরস্বতী বিদ্যাবতী বলে।

রাজকন্যার স্বয়ংবর সভা : রাজকন্যার স্বয়ংবর সভার শর্ত ছিল—যিনি এই বিদ্যাবতীকে শাস্ত্রসম্মতভাবে তর্কযুদ্ধে হারাতে পারবেন তাঁরই গলায় বরমালা দেবেন। বহুপণ্ডিত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চরম অপমান অনুভব করতে থাকেন বিদ্যাবতী। এই তর্কযুদ্ধে ঘটে এক অঘটন। রাজ পরিবারের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন ত্রিলোচন। এই ত্রিলোচনের কাছে সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন বিদ্যাবতী। ত্রিলোচনের বাড়ি ছিল উচ্চপীঠ গ্রামে। উচ্চপীঠ গ্রামের তিনজন পণ্ডিত বিদ্যাবতীর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হন। এই তর্কযুদ্ধের প্রশ্নগুলি থাকত ধাঁধার আকারে যা গভীর জ্ঞানী না হলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। পণ্ডিত ত্রিলোচনের সঙ্গে উচ্চপীঠ নগরীর পণ্ডিতরা আলোচনা করে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি জেনে ফেলেন। গোপনে বিদ্যাবতীকে প্রশ্নগুলি সাজিয়ে দিতেন পণ্ডিত ত্রিলোচন। জগন্নাথের শরীর স্বাস্থ্যটি ছিল মহাদেবের মতো। সুন্দর সুস্বাস্থ্য সবলদেহ জগন্নাথ মহাদেব সাজতেও ভালোবাসতেন। খাওয়া দাওয়ায় ছিলেন পটু। রাজবাড়িতে উৎসব, ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ রয়েছে, মহারাজ ব্রাহ্মণদের প্রচুর উপঢৌকন দেবেন। তুমি নীরব থাকবে, কোনও কথা বলবে না। যা কিছু বলবে আকার ইঙ্গিতে। পণ্ডিতগণ এইভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজবাড়িতে বিদ্যাবতীর স্বয়ংবর সভায় নিয়ে যান জগন্নাথকে। পণ্ডিতরা সভায় অনুরোধ করেন, আজ এই ব্যক্তির পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। তাই মৌনব্রত পালন করছেন। রাজকন্যাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে না। মনে মনে চিন্তা করলেই উনি বুঝে ফেলবেন এবং আকারে ইঙ্গিতে উত্তর দেবেন। সেগুলি আমরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। বিদ্যাবতী এক আঙ্গুল দেখালেন, জগন্নাথ দুই আঙ্গুল দেখান। পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা করলেন বিদ্যাবতীর প্রশ্ন হলো

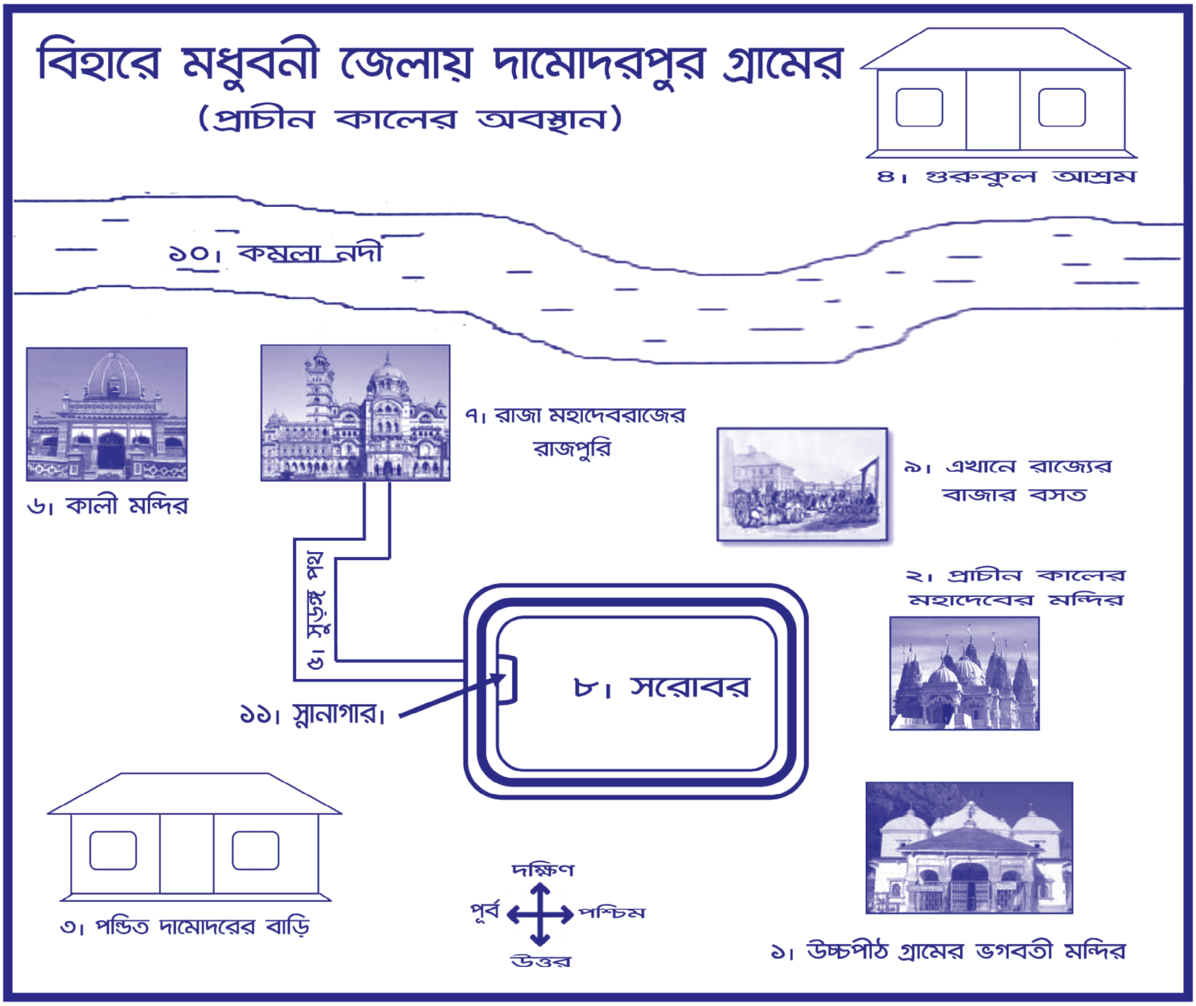

ঈশ্বর এক। পণ্ডিতরা ব্যাখ্যা করলেন ঈশ্বরের দুই রূপ। পরমেশ্বর ও রাজেশ্বর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই পৃথিবীতে যখন ধর্মের পতন ঘটে তখন আমি এই ধরাধামে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করি। আমাকে আমার কর্মকে যিনি জানেন তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। আর সকলেই অজ্ঞানী। এই পণ্ডিত ব্যক্তি মহান জ্ঞানী। এই রাজসভায় অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক হওয়ায় চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বিজয় উল্লাস করতে থাকেন। বিচারক নির্দেশ দেন উত্তর সঠিক হয়েছে। বাবা-মায়ের আশীর্বাদে বিদ্যাবতী বরমালাটি পরিয়ে দেন জগন্নাথের গলায়। পর মুহূর্তে পণ্ডিতরা রাজবাড়ির গোপন দরজা দিয়ে উত্তরদিকের কমলা নদী সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়। জগন্নাথের সঙ্গে বিদ্যাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রাজবাড়ির সকলে পরে জানতে পারেন পণ্ডিতরা ঠকিয়ে পালিয়ে গেছে। বিদ্যাবতী জানতে পারেন তাঁর স্বামী মহামূর্খ। তখন তিনি স্বামীকে তাড়িয়ে দেন। জগন্নাথ কমলা নদী পার হয়ে আত্মগোপন করে আশ্রয় নেন দামোদরের গুরুকুল আশ্রমে। পরিচয় দেন পিতৃ-মাতৃহীন ব্রাহ্মণ। নাম জিজ্ঞেস করায় বলেন কালো। গুরুদেব ডাকতেন কালিয়া। সকলে ডাকতেন 'ঠাকুর মশায়'।

মহাদেব রাজ জানতে পেরে সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে উচ্চপীঠ নগরীকে ধ্বংস করে দেন। পণ্ডিতরা আগেই অন্য রাজ্যে পালিয়ে যায়। পরে বিদ্যাবতীর সঙ্গে জগন্নাথের পুনরায় মিলন ঘটে। তখন মহাদেব রাজা উচ্চপীঠ নগরীর পণ্ডিতদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ করে দেন।

জগন্নাথের প্রতিভার বিকাশ : এই গুরুকুল আশ্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যাভ্যাসে গভীর মনোনিবেশ করেন জগন্নাথ। গুরুকুল আশ্রমের বিদ্যার্থীদের সঙ্গে বহু দেশ বিদেশ তীর্থ পরিদর্শন করেন। পরে এই আশ্রমে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। মহাদেব রাজের দুটি রাজ বাড়ি, একটি দামোদরপুর গ্রামে আর একটি জনক ঋষির আশ্রমের পাশে। দুর্গাপূজার পরেই ছদ্মবেশে এই রাজবাড়িতে নাটক করতে গিয়ে কালিদাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশদেশান্তরে। এই নাটকগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন বিদ্যাবতী। বিদ্যাবতীর প্রেরণায় এই নাটকগুলি লিখতেন কালিদাস। সরোবরে দক্ষিণ-পূর্ব পাশে মহাদেবের মন্দির, এই মন্দিরে বিদ্যাবতী প্রত্যহ পুজো দিতে যেতেন। রাজবাড়ির সকলে এই মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। বিদ্যাবতীর সখিরা হঠাৎ একদিন চিনতে পারেন, জগন্নাথ ছদ্মবেশে এখানেই আছেন। বিদ্যাবতী রাজ পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথের কাছে ভুলের জন্য ক্ষমা চান। রাজ পরিবারে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানান। সংসার জীবনে আর তিনি ফিরে আসতে রাজি হলেন না। পণ্ডিত দামোদর চিঠি লিখে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় স্থান করে দেন। সেই চিঠিতে পণ্ডিতমশাই জগন্নাথের নামকরণ করেন কালিদাস। ভারতবাসীর কাছে কালিদাস নামেই তিনি পরিচিত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজসভায় কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন তাঁদের। অল্পদিনের মধ্যে কর্মদক্ষতায় সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে ভারতবর্ষে ফিরে আসে সুবর্ণ যুগ। এই রাজসভার জনৈক পণ্ডিত চক্রান্ত করে সিংহলের অশোক কাননে কালিদাসকে হত্যা করে। রাবণের দেশে তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হারিয়ে যাওয়া এক বাঙ্গালি ধনকুবেরের কথা

কৌশিক রায়

সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা—এই তিনটি অজ গ্রামকে পুঁজি করে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেসাতির খাসতালুক হিসেবে পূর্ব ভারতে একটি সমৃদ্ধ নগরী গড়ে তুলতে জব চার্নক ও তাঁর সুযোগ্য শিল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জামাতা—চার্লস আয়ার আর্থিক সাহায্য নিয়েছিলেন সাবেকি বাঙ্গলার কয়েকজন বড়ো ব্যবসায়ীর কাছে। কালেচক্রে এই ব্যবসাদাররাই যে 'গোরা পল্টন'-এর অন্যতম রসদদার এবং বাঙ্গলার ভাঙতে থাকা নবাবতন্ত্রের বিরুদ্ধে মূর্তিমান শাইলকের অপচ্ছায়া হয়ে দাঁড়াবেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎ শেঠ আর ক্লাইভের দূষিত যুগলবন্দি দেখে। তবে, পলাশির আমবাগানে বাঙ্গলার সৌভাগ্যরবির অস্তাচলে যাওয়ার ঠিক বছর পাঁচেক আগে, বাঙ্গলার সমাজজীবনে মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের অগ্রগতির সন্ধিক্ষণে যে ধনকুবেরটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর কথা বাঙ্গলার ইতিহাসে আজ প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ রামদুলাল দে নামক সেই ধনকুবের বা সুতানুটির অবিসংবাদী 'মিলিওনেয়ার'-এর জীবদ্দশায় বঙ্গদেশের ইতিহাসে তৈরি হয়েছিল বেশ কয়েকটি অধ্যায়—নব্যবঙ্গীয় আন্দোলন এবং তার স্রষ্টা হেনরি ল্যুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও-র তিরোধান, ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের মানবহিতৈষী সংস্কার, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতার সেতুবন্ধন হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা; সুপ্রিম কোর্ট ও হিন্দু কলেজ গড়ে ওঠা; বাঙ্গলায় প্রথম ছাপাখানা তৈরি হওয়া এবং ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড সাহেবের কলমে সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের রচনা। তবে, রামদুলাল দে-র জীবনীকার এবং 'দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—যাঁদের স্ব-উদ্যোগী বা 'আঁত্র প্রনেউর' (Entrepre-neur) বলা চলে—তাঁদের কর্মময় যাত্রাটি ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে শুরু করেছিলেন রামদুলাল দে স্বয়ং। তাঁর মালিকানাধীন চারটি সুবিশাল বাণিজ্য জাহাজ বা 'আর্গোসি' উইলিয়ম শেক্স্‌পিয়রের নাটক—'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর সওদাগর আন্তোনিওর জাহাজগুলির মতোই মসলিনের কাপড়, চা,

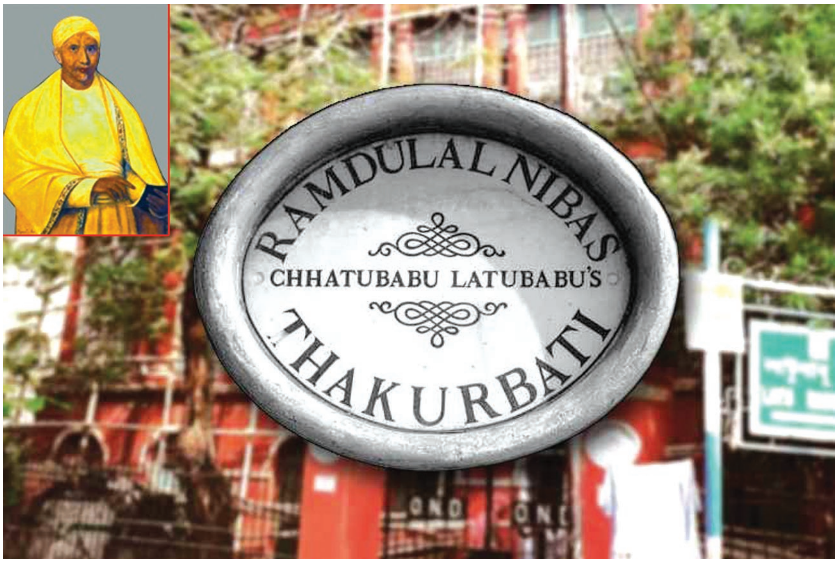

কফি, সুগন্ধি আর মশলা নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিল উত্তমাশা অন্তরীপ, দক্ষিণ চীন সাগর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আবিষ্কৃত সমুদ্রপথে। তবে, ধনাঢ্য আর বিলাসবহুল জীবন যাপন, বাইজীদের মুজরো-তে মুঠো মুঠো টাকা ওড়ানো, নিষিদ্ধ পল্লীর বারবনিতাদের জন্য সোনার মোহরভরা বটুয়া উপুড় করে দেওয়া, কারণবারির মদিরাস্রোতে ডুব দেওয়া, লাখ টাকা খরচ করে পোষা বিড়ালের বিয়ে দেওয়া---এগুলোর কোনওটাই রামদুলাল দে-র অনাড়ম্বর জীবনে কলঙ্কের দাগ বসাতে পারেনি। বেলগাছিয়াতে প্রতিদিন হতদরিদ্র, নিঃসম্বল মানুষদের ভরপেট খাওয়ানোর জন্য একটি 'অন্নসত্র' খুলেছিলেন রামদুলাল। বর্তমানের বিডন স্ট্রিটে তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। হিন্দু কলেজের বাড়ি তৈরি করার জন্য মহামতি ডেভিড হেয়ারকে ৩০ হাজার নগদ টাকা দিয়েছিলেন মানবিক ধনকুবের রামদুলাল দে। কালীঘাটের কালীমন্দিরের বাড়ির সংস্কার এবং মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা পাকা করা হয় রামদুলালেরই টাকায়।

গঙ্গাসাগর মেলাতে সমবেত পুণ্যার্থীর এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু-সন্ন্যাসীদের সেই সময় থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়াও ছিল চোর-ডাকাত-ঠগি, বাঘ আর বিভিন্ন রোগের উপদ্রব। সাগরমেলার যাত্রীদের এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি ধর্মশালা বা 'চটি' নির্মাণ করান রামদুলাল দে। বঙ্গোপসাগরের মোহনাতে ম্যানগ্রোভ বাদাবন পরিষ্কার করে তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্তদের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশও তৈরি করা হয়। মাদ্রাজে একবার সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে ত্রাণ হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের হাতে নগদ এক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন রামদুলাল দে। আসলে, নিজের চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ে সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করা এই বিনীত ধনকুবেরটি বাল্যকাল থেকে জানতেন—

দারিদ্র্য ও বঞ্চনার যন্ত্রণা কতটা মারাত্মক হতে পারে। তাঁর বাবা বলরাম দে ছিলেন বর্তমান রাজারহাট অঞ্চলের রেকজানি-র এক দরিদ্র ভাগচাষি। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকা কলকাতাতে চলে আসতে বাধ্য হন বলরাম। তবে, রামদুলালের দুর্ভাগ্য তাঁর শৈশবকালেই রোগগ্রস্ত, অনাহারী পিতা বলরামের জীবনাবসান ঘটে। দরিদ্র ঠাকুরদা আর ঠাকুমার কাছেই মানুষ হন রামদুলাল ও তাঁর ভাই-বোনেরা। ঠাকুমা নিমতলা অঞ্চলের এক ধনী ব্যবসায়ী মদনমোহন দত্তর বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। ঠাকুরদার আয়ও ছিলো যৎসামান্য। এই সময়েই মদনমোহন দত্ত-র সুনজরে পড়েন কঠোর পরিশ্রমী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ কিশোর রামদুলাল। তাঁকে ওই বয়েসেই মাসিক ১০ টাকা বেতনে 'জাহাজ সরকার'-এর চাকরি দেন মদনমোহন। রামদুলালের কাজ ছিল শহরের বিভিন্ন জাহাজঘাটে নোঙর করা অন্যান্য রাজ্যের এবং ওলন্দাজ, আর্মেনিয়ান, পর্তুগিজ ও দিনেমারদের বাণিজ্যতরীগুলি থেকে রেশমি কাপড়, ধাতুনির্মিত বাসনপত্র, চিনামাটির জিনিসপত্রের মতো বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য কিনে কলকাতার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রি করা। এই কাজ করতে করতেই ইংরেজিতে কথা বলা ও লেখা দুটোই মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেললেন রামদুলাল দে। 'বাঙ্গলার গ্যারিক' নামে খ্যাত নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন--- 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' আপ্তবাক্যটি রামদুলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সততা, স্পষ্টভাষণ, আন্তরিকতা এবং পক্ষপাত হীনতার দ্বারা নিজের মনে গেঁথে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর কথাকে দেশি-বিদেশি বণিকরা সরকারি নথি বা স্ট্যাম্প পেপারের মতোই নির্ভেজাল, নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। নথিপত্র অনুযায়ী রামদুলাল দে, মদনমোহন দত্তের সেরেস্তাতে বাজার সরকার হয়ে ব্যবসায়ীদের কাজ থেকে পাওনাগণ্ডা আদায়ের সময় থেকেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার দিকে নজর দেন। এই ব্যবসা থেকে উপার্জিত অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে রামদুলাল তাঁর ৭০ বছর বয়সি অথর্ব হয়ে যাওয়া মাতামহের ভরণপোষণ করতেন। মাতামহকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগলে রেখেছিলেন রামদুলাল। সাধারণত সুতির কাপড়, তুলার গাঁটরি, মশলা আর চিনি নিয়ে বিদেশি বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন রামদুলাল। মাদ্রাজ নিবাসী শৌখিন মেমসাহেবদের মধ্যে কাঁচের রেশমি চুড়ি আর নানারঙের কাঁচের পুঁতির মালার খুব চাহিদা হয়েছিল। রামদুলালের জাহাজে করে মাদ্রাজে নিয়মিত সেই স্বর্ণকেশী, নীললোচনা সুন্দরীদের কাছে পৌঁছে যেত সেই চুড়ি আর মালা।

ব্যবসায় কোন্ সময়ে কোন্ জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি করতে হবে এবং মুনাফার জন্য কখন ঝুঁকি নিতে হবে সেটা রামদুলাল দে ভালোই বুঝতেন।

সেজন্যই সর্বপ্রথম মার্কিন-ভারত বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় তাঁর হাত ধরেই। ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক নজরদারি থেকে সদ্য স্বাধীন হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন কাণ্ডারি --- জর্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং টমাস জেফারসনের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে রামদুলালের। রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আগমনের আগেই বাঙ্গালিদের মধ্যে বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার ইচ্ছের প্রথম সলতেটা পাকিয়েছিলেন রামদুলাল দে-ই। তাঁর উদ্যোগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন, নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সঙ্গে পূর্ব ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে হুগলি, পারাদ্বীপ ও বিশাখাপত্তনম বন্দরের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারেন এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও রামদুলাল মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক থেকে পিছু হটেননি। ১৭৯২ সালে প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান জর্জ ওয়াশিংটনের পাঠানো প্রথম রাষ্ট্রদূত বেঞ্জামিন জয়-কে কিন্তু ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল ঈর্ষাকাতর এবং স্বাধীন মার্কিনদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তবুও ১৭৮৭ সালে কলকাতায় আসা প্রথম মার্কিন সওদাগরি জাহাজকে স্বাগত জানিয়েছিলেন রামদুলাল দে। মার্কিন ব্যবসাদাররা রামদুলালের কাছ থেকে কিনতেন খাঁটি মানের চা, চিনি, কাপড় কাচার নীল বা ইন্ডিগো, আদা, চটের বস্তা, রেশম আর সুতির কাপড়, মসলিনের কাপড় এবং জেড ও ল্যাপিস ল্যাজুলি পাথরের তৈরি দামি কণ্ঠহার। বৈদিক সভ্যতা এবং ধর্মাচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন অনেক আমেরিকান বুদ্ধিজীবী। তাঁদের সংস্কৃত ভাষাতে লেখা বেদ, উপনিষদ, ব্যাকরণ এবং রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বইও সরবরাহ করতেন রামদুলাল দে। তাঁর প্রতি মার্কিন ব্যবসায়ীরা এতটাই প্রসন্ন ছিলেন যে এক আমেরিকান ব্যবসায়ী তো তাঁর সওদাগরি জাহাজটির নামই রেখেছিলেন 'রামদুলাল'। রামদুলালকে মার্কিন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের একটি সুবিশাল পোর্ট্রেটও উপহার দেওয়া হয়।

রামদুলাল দের এই মার্কিন সান্নিধ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা স্বভাবতই ভালো চোখে দেখেননি। ১৭৯৩ সালের চার্টার আইন মোতাবেক ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ওপর অতিরিক্ত আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক চাপানো হলো। এর ফলে লোকসানের মুখে পড়ল রামদুলালের তুলো, মশলা আর পাটের ব্যবসাও। তবুও অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে মোটামুটি লাভ রেখে পণ্যদ্রব্য বিকিকিনি করতে সমর্থ হয়েছিলেন রামদুলাল দে। ওই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি সেরা বণিক বা 'দেওয়ান' উপাধিও পান।

প্রজাশোষক জমিদার এবং কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন গরিব মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের যোগান দেওয়া রামদুলাল দে। সুতানুটি ও তার আশেপাশে অনেক জমি ছিল রামদুলালের। ইচ্ছে করলেই মুখে রুপোর আলবোলা-র নল নিয়ে বাকি জীবনটা বাবুগিরি করতে পারতেন তিনি। তবুও রামদুলাল তাঁর দুই ছেলে—আশুতোষ ও প্রমথনাথকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানির অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকদের ও বাস্তুহারাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। রামদুলাল দের বিস্মৃত জীবন যেন মনে করায় বিশ্বকবির সেই উক্তিকে—"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক্ / আমি তোমাদেরই লোক।" ◘

কেবল ‘বি জে পি ঠেকাও’ ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মেরুকরণ হয়েছে

দুর্গাপদ ঘোষ

কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বিজেপি বিরোধী দলগুলোর কাছে সেকুলারিজমের বড়াই স্রেফ সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণের রাজনৈতিক বাহানা। বিশেষ করে কংগ্রেস ও বামেদের সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সঙ্গে সরাসরি গাঁটছড়া বাঁধার ন্যাক্কারজনক ইতিহাস রয়েছে। এই সমস্ত দলগুলো নিরন্তর একে অন্যের বিরুদ্ধে গলাবাজি করে এলেও বিজেপি ঠেকাতে মাঝে মাঝেই অনৈতিক জোট বাঁধতে লজ্জাশরমের বালাই রাখেনি। পশ্চিমবঙ্গের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তার স্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। এর অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানের দাবি তুলে ‘ডাইরেক্ট অ্যাকসন’-এর নামে কলকাতা ও নোয়াখালিতে নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো এবং দেশভাগকারী মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়েছে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয় পক্ষই। স্বাধীন ভারতে লিগকে নিয়ে প্রথম জোট সরকার গড়ে বামেরা। প্রয়াত ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ কেরালায় এই জোট সরকার গড়েন ১৯৫৭ সালে। গা বাঁচাতে বামেরা ‘এ মুসলিম লিগ সে মুসলিম লিগ নয়’ বলে সাফাই গাইতে থাকে। পরে পরে একই গত গেয়ে বামেদের মতো একাধিকবার লিগের সঙ্গে জোট করেছে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট উভয় পক্ষই। এবারেও কেরালায় লিগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নির্বাচনে নেমেছিল কংগ্রেসিরা। আর পশ্চিমবঙ্গে কং-বাম দু’পক্ষই জোট বেঁধেছিল ফুরফুরা শরিফের পিরজাদার চেষ্টায় তৈরি হওয়া আই. এস. এফ-এর সঙ্গে। কথায় বলে ‘কানু বিনে গীত নেই।’ তেমনি বিজেপি বিরোধীদের কাছে এখন মুসলিম ভোট ছাড়া গতি নেই। এবারে

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলে এটা জলের মতো স্বচ্ছ।

মমতার দল বিধানসভায় বিপুল সংখ্যক আসনে জিতেছে। এই নির্বাচনী জয়ের পেছনে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ ছাড়াও ‘দিদি’-র নিজের কিছু সুবিধা এবং রাজনৈতিক কৌশলের ধার যে ছিল যেটা একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে এটাও বিশ্লেষণ না করে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে তাঁর দল কাদের ভোটে জিতেছে এবং কীভাবে জিতেছে। ‘তিনি’ না বলে ‘তাঁর দল’ বলা হলো এই কারণে যে, আদালতের রায়ে শেষ পর্যন্ত কী হবে না হবে তা এই প্রতিবেদন যন্ত্রস্থ হওয়া পর্যন্ত ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। কিন্তু তাঁর দলের এই জয়ে আপ্লুত হয়ে বিজেপি বিরোধীরা যাঁকে নরেন্দ্র মোদির বিকল্প মনে করে লোক দেখানো তৎপরতা চালাচ্ছেন, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণামতো তিনি নিজে কিন্তু তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের কেন্দ্রেই জিতে আসতে পারেননি। বিধানসভা নির্বাচনে এরকম একজন পরাজিত নেত্রীকে ‘বিজেপি ঠেকাও’-ওয়ালারা সবাই মিলে সত্যি সত্যি দেশের প্রধানমন্ত্রী করতে চান নাকি সবটাই কেবল মোদীবিরোধী হাওয়া ছড়ানোর কৌশল সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। আপাতত কাদের ভোটে এবং কীভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই জয় এসেছে তা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা দরকার।

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি যেটা অনুমান করা যেতে পারে তা হলো, বিজেপি হিন্দু ভোটের সিংহভাগ পেয়েছে। এটা ধরে নেওয়া হলে মমতার তৃণমূল কংগ্রেস মোট যে ২ কোটি ৮৭ লাখের মতো ভোট পেয়েছে তার মধ্যে ৮৯ লক্ষ হিন্দু ভোট আর ১ কোটি ৯৮ লাখ মুসলমান ভোট। আসন পেয়েছে গতবারের চাইতে ২টো বেশি, ২১৩ টা। অন্যদিকে মোট ৮ দফায় ৩টে আসন বাদে যে ২৯১ আসনে নির্বাচন হয়েছে তাতে বিজেপির ঝুলিতে জমা হয়েছে মোট ২ কোটি ২০ লাখের মতো ভোট। তার মধ্যে আনুমানিক হিন্দু ভোট হলো ২ কোটি ২৫ লাখের মতো আর ৩ লাখের মতো হলো মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভোট। আপাতত ধর্মীয় মেরুকরণের প্রশ্নে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান ভোটের মেরুকরণ ঘটে গেছে এবং সেটা মুখ্যত বিজেপি ঠেকানোর জন্য। যে কারণে কংগ্রেস এবং বামেদের খাতায় একটা আসনও নেই। বিজেপি গতবারের ৩টে থেকে ৭৪ টা আসন বেশি জিতে পেয়েছে ৭৭টি আসন। কংগ্রেস গতবারের ৪৪টা থেকে এবার শূন্যে চলে গেছে। বাকি ১টা আসন পেয়েছে আই এস এফ। এই আনুমানিক হিসাব যদি মোটামুটি ঠিক হয়

ফঃ ৫

তবে বিজেপি তার প্রতিদ্বন্দী তৃণমূল কংগ্রেসের চাইতে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ হিন্দুভোট বেশি পেয়েছে। অন্যদিকে টি এম সি তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি-র চাইতে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ মুসলমান ভোট বেশি পেয়ে সরকার গড়েছে। বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে আছে ২১৩ আসনে। এক হাজারের কম ভোটে জেতা হারার ব্যবধান হলো ৭ আসনে, ২৯ আসনে ব্যবধান মাত্র ৫ হাজারেরও কম ভোটে। তৃণমূল কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে আছে ৭৮ আসনে। বাম-কংগ্রেস আই এস এফ মিলে কেউ কোনো আসনে দ্বিতীয় স্থানে নেই। এই আনুমানিক পর্যালোচনার হিসেব থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এবার প্রকৃতপক্ষে কাদের ভোটের জোরে মমতা ব্যানার্জির সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। অর্থাৎ এই সরকারের প্রকৃত পরিচালক বা প্রকৃত নির্ণায়ক শক্তি কারা তা পরিষ্কার। এদিকে তা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে যে গত ১৬ আগস্ট তারিখকে মমতার সরকার 'খেলা হবে' দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল কেন? সেটা কি শুধুই এই তারিখে ইডেন গার্ডেনে একটা ফুটবল ম্যাচে গ্যালারি ভেঙে ১৬ জন দর্শকের মৃত্যু ঘটেছিল বলে? যাঁদের ওই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল তাঁরা তো কেউ 'খেলোয়াড়' ছিলেন না! খেলেন তো খেলোয়াড়রা। দর্শকরা তো খেলেন না। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে ২০২১-এর নির্বাচনে 'খেলা হবে' ডাক দিয়ে ভোটের খেলা খেলেছে টি এম সি এবং জব্বর খেলাই খেলেছে। সে রক্তারক্তির 'খেলা'-র কথা নির্বাচনী যুদ্ধের ইতিহাসে অনেক দিন ধরে লেখা থাকবে। ১৬ আগস্ট আর এক 'খেলা' খেলেছিল মুসলিম লিগ। সেই রক্তের হোলিখেলা শুরু হয়েছিল অবশ্য ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ সালে। তৃণমূল সরকার কি তবে মহম্মদ আলি জিন্নার ডাক দেওয়া 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামে সোহরাবর্দির পরিচালনায় সংগঠিত হওয়া 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে হিন্দুদের ওপর যে সাম্প্রদায়িক গণহত্যার ঘটনা ঘটেছিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই যার সংক্রমণ ঘটেছিল পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে সেই 'খেলা'-কে স্মরণ করে এবার সেই ১৬ আগস্টকে 'খেলা হবে' দিবস হিসাবে পালন করতে চেয়েছে? অন্তত এমনটাই অভিযোগ। এজন্য বিজেপি ছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো বরেণ্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান-সহ আরও কয়েকটা সনাতন হিন্দু সংগঠনও মমতার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়ে রাজ্যপাল জগদীশ ধনখড়ের দ্বারস্থ হয়েছিল যাতে ১৬ আগস্ট 'খেলা হবে' দিবস হিসাবে পালন না করা হয় এবং হিন্দুদের অন্তরের রক্তক্ষরণকে নতুন করে বাড়িয়ে তোলা না হয়। সেদিনের সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ জানতে যদি কেউ আগ্রহী থাকেন তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রয়াত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা ইতিহাস পড়ে দেখতে পারেন। আতঙ্কে শিউরে উঠতে হবে।

কিন্তু এবারের ভোটের ফলাফলের এই পর্যালোচনাকে উপেক্ষা করে নির্বাচনের মাঠে বিজেপি বিরোধীরা তৃণমূলের এই জয়ে উচ্ছাসের জোয়ারে এমনভাবে ভেসে যাচ্ছেন যে দিদির আঁচল ধরে জোট বেঁধে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মহাজোট গড়ে নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপিকে হারাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আর এই সাময়িক জোয়ারে অগ্রণী হয়ে দিল্লি জয়ের স্বপ্ন দেখছেন মমতাও।

কাদের ভোটে টি এম সি-র সরকার গঠিত হয়েছে তা যেমন একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গেছে, তেমনি কীভাবে এই জয় এসেছে সেটাও একটা ইতিহাস। আগেই বলা হয়েছে মমতার নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশলকে অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন 'খেলা হবে' এবং 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' স্লোগান। প্রার্থী মনোনয়ন, পুলিশ প্রশাসনকে আগে থেকেই চমকানো, দায়িত্বে থাকা অফিসারদের ফাঁসানোর হুমকি, সি আর পি এফ চলে গেলে দেখে নেবার হুংকার, নন্দীগ্রামে পায়ে চোট পাওয়ার পর সহানুভূতির ভোট কুড়োনোর জন্য প্রায় একমাস ধরে ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে সর্বত্র হুইল চেয়ারে ঘোরা ইত্যাদি। এর বাইরে আরও যেভাবে ভোট দখল করা হয়েছে তা হলো, সন্ত্রাস। বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতৃত্বদের 'বহিরাগত' তকমা দেওয়া এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্পর্কে যথাক্রমে 'কিম্ভূতকিমাকার', 'হুদুল কুতকুত' ইঙ্গিত করার মতো মেঠো ভাষা ব্যবহার, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকে 'নাড্ডা, হাড্ডা, গ্যাড্ডা' বলতে থাকা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ওপরে পর্যন্ত ইঁট-পাথর মেরে আক্রমণ করা, রাজ্য নেতাদের ওপর হামলা, জয় শ্রীরাম ধ্বনির বিরুদ্ধে গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে আসা ইত্যাদি অশোভনীয় আচরণ। নিমতায় বিজেপি কর্মীর মায়ের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা করা ছাড়াও গ্রামগঞ্জে এমনকী শহরগুলোতেও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা করে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া। বোমাবাজি, বন্দুকবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাস সৃষ্টির কোনোকিছুই বাদ রাখেনি তৃণমূল কর্মীরা। সমস্ত ঘটনাকে হয় অস্বীকার করে যাওয়া নয়তো বিজেপি-র অন্তর্দ্বন্দ্ব বলে তৃণমূলি মস্তানদের এসব কাজে প্রচ্ছন্নভাবে মদত দেওয়া এবং উৎসাহিত করা হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। তাতেও যখন বিজেপি-কে ঠেকানো যাবে না বলে মনে হয়েছে তখন চেষ্টা করা হয়েছে গ্রাম-শহর-মহানগর সর্বত্র বিজেপি ভোটারদের বুথে পৌঁছতে না দেওয়ার। আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের যেকোনো বুথের ১০০ মিটারের বাইরে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করার বা ব্যবস্থা নেবার এক্তিয়ার নেই। তাই বুথ জ্যাম বা বুথ দখলের চেষ্টা না করে ১০০ মিটারের মধ্যে যাতে বিজেপি সমর্থকরা পৌঁছতে না পারেন টি এম সি-র মস্তান বাহিনীকে দিয়ে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভোটারদের মোড়ে মোড়ে ভয় দেখিয়ে, বোমাবাজি করে আটকে রাখা হয়েছে। এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো পশ্চিম কলকাতা। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে শুরু করে উত্তর ভূপেন বসু এভিনিউ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে এবং ভেতরে ভেতরে অলি গলিতে বম্বিং করে ভোটারদের বাড়ি থেকে বেরনোর রাস্তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা কেবল অভিযোগ নয়, বাস্তব সংবাদ। এইভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র বহু প্রার্থীর নিশ্চিত জয়কে পরাজয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে। না হলে,

পর্যবেক্ষকদের ধারণা আরও অন্তত ৩৫—৪০ লক্ষে বিজেপি সমর্থক নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারতেন। সেটা হলে বিজেপি ২ কোটি ৬৩ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ভোট পেতে পারত। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট কমে হতে পারত ২ কোটি ৪৭ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৫১ লক্ষ। তাতে আসন সংখ্যা ঠিক বিপরীত হয়ে যেত এটা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু বিজেপি হয়তো ১৫৬ থেকে ১৬০-এর মতো আসন পেত। বিজেপি-র প্রাপ্ত এবং সম্ভাব্য ভোট কিন্তু সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। ভোট শুরু হওয়ার ঠিক আগে পর্যন্ত ট্রেন্ড সেদিকেই ছিল। কিন্তু এটা যখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং নির্বাচন কৌশলী সংস্থা আই প্যাক প্রধান প্রশান্ত কিশোর যখন এন ডি টি ভি-র এক কর্তা রবীশ কুমার এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে গোপনে কথা বলার সময় বলেই ফেলেন যে পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে তখন হঠাৎ করে মুসলমান ভোটাররা যাঁদের মতামত নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন মুখ্যত মোল্লা-মৌলভিরা তাঁরা রাতারাতি কৌশল বদলে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট এমনকী ফুরফুরা শরিফের পিরজাদার দলকে পর্যন্ত ব্রাত্য করে এককাট্টাভাবে ঢেলে ভোট দেন টিএমসি-কে। এদেশে মুসলমান ভোটাররা এরকম আনেকবারই করেছেন। ১৯৭৭, ১৯৭৯, ১৯৮৪, ১৯৮৯ সালে এর স্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। ইন্দিরা গান্ধীকে হারিয়েছেন, তাঁকে ফের জিতিয়েছেন, রাজীব গান্ধীকে জিতিয়েছেন আবার তাঁকে হারিয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহকে জিতিয়েছেন। এটা তাদের নিজস্ব মতামতের বিষয় যা সব ক্ষেত্রে একরকম থাকে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি-র নিশ্চিৎ জয়কে ধর্মীয় মেরুকরণের ফাঁদে আটকে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি ঠেকাতে এবার মুসলমান মেরুকরণ হয়েছে এ রাজ্যে। এক্ষেত্রে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের প্রশ্ন ওঠে না। কারণ এটা সকলেই অবগত ছিলেন যে এ রাজ্যে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের ঢল, বিগত কয়েক দশক ধরে তাঁদের

তুষ্টিকরণ এবং পাইকারি হারে বেআইনিভাবে ভোটার করা, সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে নিরন্তর চোরাচালান, জালনোটের কারবারে বাধা না দেওয়া, 'হুজি'-র মতো সন্ত্রাসবাদীদের অবাধে ঘাঁটি গাড়তে দেওয়া, বেআইনি অস্ত্র ও বোমার কারখানা গড়ে উঠতে দেওয়া, নারী পাচার, ধর্মান্তরকরণ বিরোধীদের বিরুদ্ধাচারণ করা, মহারাষ্ট্র থেকে পাকড়াও করে বাংলাদেশে পাঠানোর পথে উলুবেড়িয়ায় ট্রেন থামিয়ে মহারাষ্ট্র পুলিশদের মারধর করে অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরা চলে আসতে থাকার কারণে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস এবং টি এম সি-র বিরুদ্ধে ক্রমাগত জোট বাঁধতে বাঁধতে এবার পরিবর্তনের একটা প্রকৃত বিকল্প মঞ্চ পেয়ে হিন্দু ভোটাররা বেশিরভাগই বিজেপি-কেই ভোট দিতে চলেছেন। এটাকে হঠাৎ করে রাতারাতি কৌশল বদলে হিন্দু মেরুকরণ বলা যায় না। এবার হিন্দুদের এককাট্টা হয়ে বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল দীর্ঘদিনের জমা ক্রোধের ফসল এবং তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর একেবারে উলটো চিত্র লক্ষ্য করা গেছে কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলে প্রশান্ত কিশোরের 'কৃতিত্ব'-কে বড়ো করে দেখার কিছু নেই। তামিলনাড়ুতে সরকার বদলাবদলি একটা রুটিন ব্যাপার। তার ওপরে এবার এ আই এ ডি এম কে দলে জয়ললিতা পরবর্তী যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষ করে শশীকলার ভাইপো টি টি ভি দিনকরণ এবং মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী ও উপমুখ্যমন্ত্রী পি ভি পেনিরসিলভামে মধ্যে সংঘাত যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল তাতে ডি এম কে-র ক্ষমতা দখল ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষামাত্র। এটা জেনেই প্রশান্ত কিশোর সেখানকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গে গতবারের মাত্র ৩টে আসন থেকে একলাফে বিজেপি সরকার গড়ে ফেলবে এটা কেউ ধারণাও করেননি। মমতারই ফের সরকার গড়ার সম্ভাবনা প্রায় পুরো মাত্রায় বহাল ছিল। প্রশান্ত কিশোর এর সুযোগ নিয়ে কৃতিত্ব জাহির করার জন্যই তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই বুঝতে পারলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পাশার দান উলটে দিতে চলেছে তখনই তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতার দায়িত্ব নিয়ে নেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফল অন্যরকম হলে তাঁকে কেউ আর পরামর্শদাতা করতে চাইতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু যাকে বলে 'ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে', পশ্চিমবঙ্গে সেটা হয়ে যাওয়ায় পিকে-র কেরামতি বেড়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবে নবজ্যোত সিংহ সিন্ধু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হবার ফলে পাঞ্জাব কংগ্রেসের জয় নিয়ে সন্দিহান হয়ে পি কে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টার দায়িত্ব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন গত ৫ আগস্ট।

(চলবে)

With Best Compliments from :

A Well Wisher

গোপাল পাঁঠার জন্য বেঁচে গিয়েছিল হাওড়া ব্রিজ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছিল কালো দিন। ওই আগস্ট মাসের ১৬-১৮ তারিখ পর্যন্ত একতরফা হিন্দু হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, হিন্দুদের ধনসম্পদ লুঠ, গৃহদাহ অবাধে চালিয়েছিল মুসলিম লিগের গুন্ডারা। এই গুন্ডাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) সোহরাবর্দি।

এই হিন্দুহত্যা কারা আরম্ভ করেছিল, কেমন তার প্রস্তুতি, কোথায় তার সূত্রপাত, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এসব ব্যাপারে তথ্যবিকৃতি ও সত্যের অপলাপে পারদর্শিতা প্রদর্শনই এখনকার প্রগতিশীলতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ভারতের জন্মলগ্নের নগ্ন ইতিহাস সেকুলার রাজনীতির কারবারিরা ভুলিয়ে রাখতে চায়। ঘাতকের রক্তাক্ত জোব্বার উপর সাদা চাপকান চড়িয়ে প্রভুদের মনোরঞ্জন করে। এবারে সেই চাপকান একটু সরিয়ে ঘাতকের আসল রূপটি দেখা যাক।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৪৬ সালের ২৭-২৮ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের 'Direct Action' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ থেকে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির হয় ১৬ আগস্ট। জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য গোপন রাখেননি। নিয়মতান্ত্রিক পন্থা বর্জন করে যে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে জিন্না বলেছিলেন— 'Now the

time has came for the Muslim Nation to resort to direct action. I am not prepared to discuss ethics. We have a pistol and are in positian to use it.' (শ্যামাপ্রসাদ : বঙ্গভঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পৃ. ৮৬)

অর্থাৎ 'আমরা নীতিশাস্ত্র আলোচনায় প্রস্তুত নই। আমাদের হাতে পিস্তল আছে, আমরা তা ব্যবহার করতেও জানি।'

প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে লক্ষ্য রেখে হিন্দুরা যেন পুলিশের সাহায্য না পায় তার জন্য সোহরাবর্দি রাজ্যের ২৪টি পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে হিন্দু পুলিশ অফিসার সরিয়ে ২২টিতে মুসলমান পুলিশ অফিসার নিয়োগ করেন।

১৬ আগস্ট সকালে অপ্রস্তুত ও অসাবধান হিন্দুদের ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলিম লিগের গুন্ডাবাহিনী সরকারি মদতে। ওইদিন থেকে সোহরাবর্দি ও মেয়র ওসমান খান বসেছিল লালবাজার পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারে। সেখান থেকেই তারা নজরে রাখছিল কট্টরপন্থীরা কতজন হিন্দুকে মারতে পারলো।

ওইদিন ধর্মতলার মিটিং-এ সোহরাবর্দি বলেছিল— '২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম; যা করতে পারিস কর।' সোহরাবর্দির ১৬ আগস্টের মিটিঙে কমরেড জ্যোতিবসু ও লিগ মন্ত্রীসভার সদস্য বরিশালের যোগেন মণ্ডলও উপস্থিত ছিলেন।

১৬ আগস্ট একের পর এক এলাকায় আক্রমণ চলতে থাকে। রাজাবাজার, মেটিয়াব্রুজ, এন্টালি, পার্কসার্কাস প্রভৃতি এলাকায় হিন্দু পুরুষ ও নারীদের মৃতদেহগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে। রাজাবাজারে স্কুলের সামনে চারটি মেয়েকে বলাৎকার করে তাদের স্তন কেটে নিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় লটকে দেওয়া হয়েছিল। রেহাই পায়নি শিশুরাও। ক্যানিং স্ট্রিটে হত্যা ও লুণ্ঠন, ধর্মতলায় ধ্বংসলীলা, কে.সি. বিশ্বাসের বাড়ি আক্রান্ত। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে দু'দিন ধরে অত্যাচার। হিন্দুবস্তি ভস্মীভূত, অগ্নিতে শিশু নিক্ষেপ, নারকেলডাঙ্গা এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। যত্রতত্র হিন্দুদের মৃতদেহ। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কোথাও হিন্দুহত্যা বাদ যায়নি।

১৭ আগস্ট হত্যার বীভৎসতা সবচেয়ে বেশি ছিল। ১৮ আগস্ট বিকেল পর্যন্ত একতরফা হিন্দুহত্যা চলে। এরপর প্রতি আক্রমণ শুরু হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা দেখে ইংরেজ ঐতিহাসিক লিওনার্ড মোসলে লেখেন— '১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের কুৎসিত ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে কলিকাতাকে যে ৭২ ঘণ্টার জন্য অস্থিময় কবরখানায় পরিণত করিয়াছিল ইহা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, উহা নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা ছাড়া বেশি কিছুই করিয়াছে। ...চৌরঙ্গি স্কোয়ারে পুরুষ, নারী ও শিশুর পুঁতিগন্ধময় মৃতদেহগুলি নর্দমায় পড়িয়াছিল যে পর্যন্ত না ভারতের বিশ্বস্ত নোংরা পরিষ্কারক শকুন উহা পরিষ্কার করিয়া দেয়।'

১৮ আগস্টের বিকেল থেকে গোপাল পাঁঠা প্রতি আক্রমণ শুরু করেন। কে এই গোপাল পাঁঠা? তাঁর সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। গোপাল পাঁঠার পদবি মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বৌবাজারের মালিঙ্গা লেনের বাসিন্দা। তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালের সাত সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ২০০৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। বিপ্লবী অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। এই গোপাল বিধান চন্দ্র রায় ও সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরাগী ছিলেন। বিপ্লবী দলের সঙ্গেও গোপালের যোগাযোগ ছিল। 'রডা' কোম্পানির অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। কলেজস্ট্রিটে গোপালের পারিবারিক একটি পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল। সেই সুবাদে গোপালকে 'গোপাল পাঁঠা' বলে ডাকা হতো। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ থাকায় তার কাছে কিছু দেশি পিস্তল, হাতবোমা ও কিছু তরোয়াল ছিল। কিন্তু গোপাল পাঁঠা পিস্তল ব্যবহার করতেন না।

১৬-১৭ আগস্টের ভয়াবহ হিন্দুহত্যা দেখে গোপালবাবু এক হাজার হিন্দু ও শিখ তরুণকে একত্রিত করে প্রতি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আসা আমেরিকান সৈন্যদেরকে বোতল বোতল হুইস্কি ও মদের বিনিময়ে আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করেন। প্রতি আক্রমণের ধরন ঠিক করে দেন গোপাল। যেমন— কোনো মুসলমান মা-বোনকে আক্রমণ করা হবে না এবং নিরস্ত্র মুসলমানকেও আক্রমণ করা হবে না। শুধুমাত্র সশস্ত্র মুসলমানদের ধড় থেকে মুণ্ডু কেটে ফেলতে হবে। আর মুসলমানরা একজন হিন্দুকে মারলে দশজন মুসলমানকে মারতে হবে। এই নিয়ম মেনে একের পর এক মুসলমানকে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। এই প্রতি আক্রমণের ফলে সোহরাবর্দি প্রমাদ গুনলেন।

ঠেলায় পড়ে সোহরাবর্দির অবেদনে কংগ্রেসের নেতারা দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন গোপালকে অস্ত্র সমর্পণ করানোর জন্য। গন্ধীজী গোপালকে ডেকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বললেন। উত্তরে গোপাল গান্ধীজীকে বলেছিলেন— 'তিনদিন ধরে কলকাতায় হিন্দুহত্যা চলছে, এতদিন আপনি কী করছিলেন? তারপর বললেন— হিন্দুদের সম্মান রক্ষায় ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র তো দূরের কথা একটা সূঁচ পর্যন্ত জমা ছিল না। নেতাজী আসছেন, তাঁর কাছেই অস্ত্র সমর্পণ করব।'

মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠনের প্রধান জি.জি. আজমিরি ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান (পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) গোপালের কাছে করজোড়ে অনুরোধ জানালেন এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য। সোহরাবর্দিও গোপালের কাছে অস্ত্র সমর্পণের আর্জি জানিয়ে নিষ্ক্রিয় পুলিশকে সক্রিয় করে তুললেন। এভাবেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো মুসলিম লিগ। ধীরে ধীরে দাঙ্গা থেমে গেল।

সোহরাবর্দির মেয়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন হরেন ঘোষ। সোহরাবর্দির পরিকল্পনা ছিল হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়াল হল, টালা জলট্যাঙ্ক, শিয়ালদা রেলস্টেশন ইত্যাদি ধ্বংস করে দেবার। সেই পরিকল্পনাটা শুধু জানত তার মেয়ে। সোহরাবর্দির মেয়ে এই গোপন তথ্য তার গৃহশিক্ষককে জানিয়ে দেয়। গৃহশিক্ষক হরেন ঘোষ সে খবর গোপালকে জানান। সঙ্গে গোপালের ছেলেরা ওই স্থানগুলোর দখল নেয়। যার জন্য সেগুলো রক্ষা পায়। সোহরাবর্দির সন্দেহ হয় হরেন ঘোষকে। সোহরাবর্দির নির্দেশে তার লোকেরা হরেন ঘোষকে ধরে তার দেহ কেটে ছয় টুকরো করে রাস্তায় ফেলে দেয়।

গোপালের পরাক্রমে সোহরাবর্দির মতো সরকারি বলে বলীয়ান বর্বরও ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। রক্ষা পায় কলকাতার অবশিষ্ট হিন্দু জনগণ, রক্ষা পায় নগর কলকাতা। আজ আমরা গোপাল মুখোপাধ্যায় বা গোপাল পাঁঠাকে ভুলে গেছি বা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে জাতি তার রক্ষককে ভুলে যায় আর ভক্ষককে পুজো করে সে জাতিকে কেউ বাঁচাতে পারে না। ইতিহাসকে যারা ভুলে যায় ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। বর্তমানে এরাজ্যে যে পরিস্থিতি চলছে অর্থাৎ রাজ্যে বিরোধী রাজনীতির নামে যেভাবে হিন্দু হত্যা চলছে শাসকের মদতে, তাতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রতিটি থানায় দু' একজন করে গোপাল পাঁঠার প্রয়োজন। নচেৎ শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শাসক দলের কোনো অসুবিধাই হবে না। ◻

‘মেরি ঝাঁসি দুংগি নেহি’

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সভাসদ মোরপন্থ তাম্বে। তাঁর একমাত্র কন্যা মণিকর্ণিকা। খেলার সাথীরা তাকে মনু বলে ডাকে। মনু স্কুলে যায়, ঘোড়ায় চড়ে, তরোয়াল চালনা শেখে। বাড়ির মেয়েরা বলে মেয়েদের লেখাপড়া কোন কাজে লাগবে? কিন্তু মনুর ঠাকুমা বলতেন, ও একদিন রাজরানি হবে।

মনু বড়ো হয়েছে। তার মা বললেন মনুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। মোরপন্থজী বললেন, জ্যোতিষী বলেছে মনুর বিয়ে হবে রাজার সঙ্গে। হলোও তাই। মনুর বিয়ে হলো ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে। বিয়ের দিন ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর নামানুসারে তার নাম রাখা হলো লক্ষ্মীবাঈ। যথাসময়ে লক্ষ্মীবাঈয়ের পুত্র হলো। কিন্তু তিনমাসের মধ্যেই পুত্রটি মারা গেল। রাজা দুঃখে ও হাতাশায় ভেঙে পড়লেন। ১৮৫৩ সালে মৃত্যুর একদিন আগে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করলেন। লক্ষ্মীবাঈ ভাবলেন ঝাঁসির প্রজাদের ভাগ্য এখন তাঁর হতে। তিনি দক্ষ হাতে শাসনকাজ চালাতে লাগলেন। খরায় পীড়িত চাষিদের কর মকুব করে দিলেন। তাঁর রাজ্য শাসনে প্রজারা খুশি হলো।

এই সময় লক্ষ্মীবাঈ তাঁর দত্তকপুত্রকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইংরেজরা এটা মানতে চাইল না। তাদের এতদূর ধৃষ্টতা যে তাদের এক প্রতিনিধি এসে জানালো তারা ঝাঁসিকে ব্রিটিশ অধীনে নিয়ে নিতে চায়। এই কথা শুনে রানি লক্ষ্মীবাঈ গর্জে উঠে বললেন মেরি ঝাঁসি দুংগি নেহি। রাজ্যের সকলে রানির এই মানোভাবে খুশি হলো। ইংরেজরা স্বত্ববিলোপ আইনের বলে একে একে দেশীয় রাজ্যগুলি দখল করে নিচ্ছিল। ওরা আমাদের তাঁতশিল্প ধ্বংস করে দিল। কিন্তু রানি বসে বসে কাঁদবার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি। পরিষ্কার তিনি জানিয়ে দিলেন ইংরেজদের আইন তিনি মানবেন না।।

এদিকে জাতীয়তাবাদী সিপাহিরা সারা দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ করে প্রাণ দিলেন। ইংরেজ অফিসারদের মারতে মারতে সিপাহিরা দিল্লি এসে বৃদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করল। ধীরে ধীরে তারা দেশের বড়ো বড়ো শহর দখল করে নিল। লক্ষ্মীবাঈ প্রজাদের সর্দারদের এক সভা ডাকলেন। প্রজারা জানালো ঝাঁসি আমরা ইংরেজদের হাতে তুলে দেব না। ইতিমধ্যে রানির শত্রু কিছু দেশীয় রাজা ইংরেজদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁসি আক্রমণ করল। ওরা দুর্গের কাছে আসতেই রানির কামান গর্জে উঠল। আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হঠল। কিন্তু রানি ভয় পাবার পাত্রী নন। তিনি সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে বললে, ঝাঁসি কখনও পরাজয় স্বীকার করে না। তিনি নিজে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন।

২৫ মার্চ, ১৮৫৮ সাল। ইংরেজরা কামান নিয়ে আবার ঝাঁসি আক্রমণ করল। রানির গোলন্দাজ বাহিনী কামান দিয়েই জবাব দিতে লাগল, কিন্তু এক রাতে এক বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের ঝাঁসি দুর্গে ঢোকার পথ দেখিয়ে দিল। রানি অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারি হাতে তার সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই আক্রমণে বহু ইংরেজ সৈন্য মারা পড়ল। রানি সেনাধ্যক্ষদের ডেকে বললেন, যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত তারা আমার সঙ্গে আসুন। বাকিদের দুর্গ ত্যাগের অনুমতি দিচ্ছি। মধ্যরাতে রানি তাঁর দত্তকপুত্রকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কাল্পিতে রাওসাহেবের শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন। ইংরেজরা কাল্পিও আক্রমণ করল এবং রানিকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিল। রানি বললেন আমি আত্মসমর্পণ করব না। যুদ্ধ শুরু হলো। রানি অমিত তেজে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রানি মারাত্মকভাবে জখম হলেন। রানিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। রানির শেষ সময় উপস্থিত, তিনি আদেশ দিলেন, তাঁর দেহ যেন শত্রুর হাতে না পড়ে। তিনি সেনাপতিদের বললেন, স্বাধীনতা দূরে নয়, আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যান। রানি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সৈন্যরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে রানির শেষকৃত্য সম্পন্ন করল।

এক রানি দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য অশ্বপৃষ্ঠে একের পর এক যুদ্ধ করে চলেছেন— এই দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না।

(শাশ্বত ভারত থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

আশুতোষ কুইলা

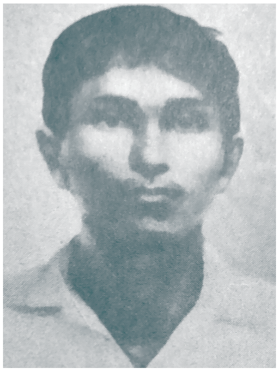

আসুতোষ কুইলা ছিলেন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি মহিষাদলের বিদ্যুৎবাহিনী দলের সভ্য ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৪ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মাধবপুরে। তিনি কল্যাণচক গৌরমোহন ইনস্টিটিউটে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মহিষাদল পুলিশ থানা আক্রমণকালে পুলিশের গুলিতে মাত্র ১৮ বছর বয়সে বীরগতি প্রাপ্ত হন।

জানো কি?

- মুঘলসরাই জংসনের নাম পণ্ডিত দীনদয়াল স্টেশন করা হয়েছে।
- নবগঠিত ইস্টকোস্ট রেলওয়ের সদর দপ্তর ভুবনেশ্বরে।
- কন্যাকুমারী--- ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেসের রুট ভারতের দীর্ঘতম রুট।
- ভারতের রেল ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ।
- ভারতে প্রথম ট্রেন চালু হয় ১৮৫৩-র ১৬ এপ্রিল।
- রেলওয়ে স্টাফ কলেজ বড়োদরায় অবস্থিত।
- অসমের ব্রহ্মপুত্রনদের ওপর ভারতের দীর্ঘতম বগিবিল রেলওয়ে ব্রিজ

ভালো কথা

পায়রায় স্নেহ

আমাদের বাড়ির গোয়ালঘরে একটা ঝুড়িতে দুটো পায়রা বাসা বেঁধে দুটো ডিম দিয়েছিল। ডিম ফুটে যেদিন বাচ্চা হয়েছিল, সেদিন রাতেই পায়রা দুটোকে ভামে খেয়ে ফেলেছে। ঠাম্মি ছানাদুটোকে এনে বারন্দায় তুলোর উপর রেখে দিয়েছে। তখনই অন্যদুটি পায়রা ছানাদুটির কাছে উড়ে এসে বসল। কিছুক্ষণ দেখার পর ছানাদুটির মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে খাওয়াতে শুরু করল। এরপর প্রতিদিন এসে খাওয়ায় ঠাম্মি বলল, ওরা বুঝতে পেরেছে যে ছানাদুটির মা-বাবা নেই কিংবা ওদেরও ছানা হারিয়ে গেছে। তাই নিজের ছানা মনে করে খাওয়াচ্ছে। মা বলল পশুপাখির মধ্যে কেউ অনাথ হয় না। কেউ না কেউ ওদের নিয়ে বড়ো করে।

যুথিকা দাস, নবম শ্রেণী, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) দ ম আ স্ত পা	(১) হি ং প শ রা র তা স
(২) ধি র্মা ণ র ক	(২) দ্যা ং প স খ্যা রি বি ন

৩০ আগস্ট সংখ্যার উত্তর	৩০ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) পবনপুত্র (২) রাধামোহন	(১) রামধোলাই (২) সমজাতীয়

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (২) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দঃ দিঃ (৩) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (৪) অনামিকা পাল, শিলচর, অসম।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

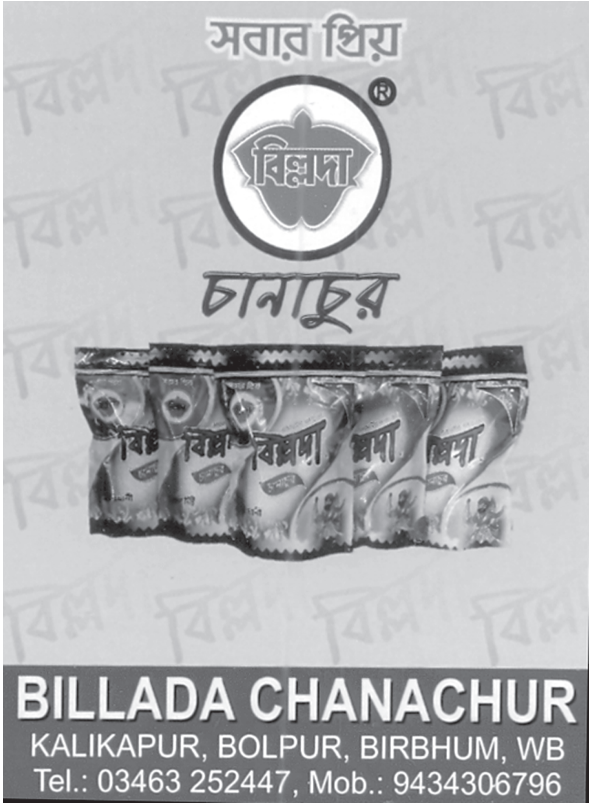

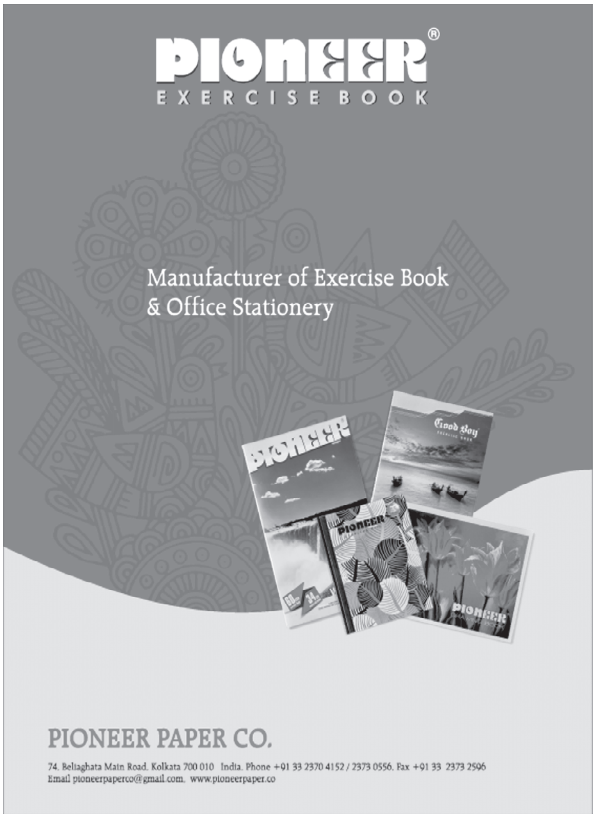

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

হিন্দুত্ববাদে আস্থা ছিল বুদ্ধদেবের

তথাগত রায়
(বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ)

বুদ্ধদেব গুহ ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী লেখক। ওঁর মতো প্রকৃতিপ্রেমী লেখক বাংলা সাহিত্য জগৎ খুব বেশি দেখেনি। আরণ্যক প্রকৃতির যে বিবরণ ওঁর লেখায় পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখ সমৃদ্ধি মিশ্রিত যে বাস্তব চিত্র তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে তাতে আমি মুগ্ধ। ব্যক্তিগত ভাবে বুদ্ধদেব গুহর লেখার আমি একজন ভক্ত। বুদ্ধদেব গুহ একজন প্রকৃত হিন্দুত্ববাদী মানুষ ছিলেন। তবে ওঁর লেখায় তার প্রকাশ আমরা কমই পেয়েছি। কারণ বিভিন্ন পাবলিশিং হাউস এবং সংবাদমাধ্যম বিরোধিতা করত। একবার উনি বলেছিলেন আমায়, একটি যে প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম তার জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ লেখার বিরুদ্ধে সাবধানতার বাণীও শুনিয়েছে বহুবার। তারমধ্যেও যতদূর সম্ভব তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে গেছেন। ঋজুদা সমগ্র চতুর্থ অধ্যায়ে, তিনি পরিষ্কার লিখেছেন যে 'হাজারিবাগে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, তাতে চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে বই কী'। এই দুঃসাহসিক কথা লেখার সাহস এখন দু'একজন দেখাতে পারেন কিন্তু যখন উনি লিখেছিলেন ১৯৮০-র দশকে কজন এভাবে লিখতে পারতেন? পরবর্তীকালে আমি যখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিই তখন পশ্চিমবঙ্গে এটি অত্যন্ত দুর্বল রাজনৈতিক দল। তার মধ্যেও বুদ্ধদেববাবু আদর্শতাড়িত হয়ে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে ছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির ম্যানিফেস্টো ওঁর অফিসে বসে আমরা দুজনে তৈরি করেছিলাম। তিনি ছিলেন একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক, প্রকৃতিপ্রেমিক ও হিন্দুত্ববাদী মানুষ। ওঁর চিন্তাধারার আরেকটি দিক হলো উনি কমিউনিজমের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ওঁর বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্যে 'ভাবার সময়' বলে একটি প্রবন্ধে উনি দেখিয়েছেন কেন্দ্রে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কী অবিচার করেছে এবং তার সঙ্গে কমিউনিস্টরা কীভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পায়ে কুড়ুল মেরেছে।

নিখাদ প্রেমের সাহসী লেখক

প্রবুদ্ধ রাহা
(সংগীত শিল্পী)

বুদ্ধদেবদাকে প্রথম দেখেছিলাম প্রায় ৫০ বছর আগে, সালটা ১৯৭১। দক্ষিণীতে তখন গান শিখছি, আমি তখন খুবই ছোটো, ১০ বছর হবে, বুদ্ধদেবদা তখন প্রায় ৩৫ বছর। দক্ষিণীর অফিস ঘরে মোহরদি, বুদ্ধদেবদা, ঋতুদি আরও অনেক নামি পরিচিত মুখের ভিড় জমত। যদিও তখন এঁদের কাউকেই চিনতাম না, তবে আমার আর শ্রীকান্তর (শ্রীকান্ত আচার্য) যখন দক্ষিণীতে প্রোগ্রাম থাকত, কোনোটাই বুদ্ধদেবদা মিস্ করতেন না, অসম্ভব ভালোবাসতেন গান শুনতে। মনে আছে, প্রোগ্রামের শেষে গ্রিনরুমে এসে বহুবার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। পুরাতনী গান ভালোবাসতেন খুব। ছোটোবেলায় শানু লাহিড়ীর কাছে বুদ্ধদেবদার গানের হাতেখড়ি, পরবর্তীকালে রাম কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পুরাতনী গান। বন্ধুদের সঙ্গে ঘরোয়া আসরে গান গেয়ে বাজিমাত করতেন যেমন, তেমন স্টেজের পারফরমেন্সও ছিল সাবলীল। দুটো অনুষ্ঠান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। মনে আছে শিশিরমঞ্চে বুদ্ধদেবদার গান, জমিয়ে দিয়েছিলেন সন্ধ্যেটা। দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠাতা শুভ গুহঠাকুরতার আত্মীয়া ঋতু গুহর সঙ্গে ভালোবাসা, পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। দক্ষিণীর বসন্তের দিনগুলিকে নিয়েই গোটা উপন্যাস 'খেলা যখন'।

পরে আমার কলেজ লাইফে যখন বুদ্ধদেবদার 'মাধুকরী' এবং 'কোয়েলের কাছে' হাতে এল তখন মানুষটি সত্যি আরও বেশি ইন্সপায়ার করলেন আমার আমিটাকে। নিখাদ প্রেমের সপ্রতিভ সাহসী লেখার পাশাপাশি পশুদের সাইকোওলোজি নিয়ে অরণ্যপ্রেমের হাত ধরে আমি যেন নতুন দিক দেখতে পেলাম। এটুকু বলতে পারি, আজ বুদ্ধদেবদা চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টিগুলি জ্বলজ্বল করবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের হাতে।

ফ ঃ ৬

আদ্যন্ত বাঙ্গালি নির্ভেজাল রোম্যান্টিক

অভিজিৎ মোহিন্তা
(বিশিষ্ট ব্যবসায়ী)

কোনো প্রাণীর গায়ের চামড়া মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা হওয়া বিরল অবস্থাকে বলে Albino। এটা আমি স্কুলের বইয়ের আগে জেনেছিলাম আনন্দমেলা পূজাসংখ্যা থেকে। আরও স্পষ্টভাবে বললে বুদ্ধদেব গুহ নামে এক লেখকের কাছ থেকে। গহন অরণ্যে তাঁর সৃষ্ট 'ঋজুদা'র অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলো সেই বয়সে আমার মতো বঙ্গদেশের বহু কিশোরের মধ্যে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ তৈরি করত। হয়তো যার সাক্ষী আজও সেই পূজাসংখ্যার হলুদ হয়ে যাওয়া পাতায় লেপ্টে থাকা একটা ভাতের টুকরো। যা মায়ের বকুনি সত্ত্বেও খেতে খেতে গোগ্রাসে গেলা সেই লেখাগুলোয় আটকে গেছে। পরবর্তী সময় লুকিয়ে আনন্দলোকে পড়া তাঁর 'চানঘরের গান'-এ বয়ঃসন্ধির রোমাঞ্চ হয়তো অনেকেরই স্মৃতিতে থাকবে।

এরপর একদিন তাঁকে প্রথম দেখলাম কলকাতা দূরদর্শনের 'নববর্ষের বৈঠকে'। রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ বা নিধুবাবুর টপ্পায় কী সাবলীল বিচরণ। সঙ্গে বিরল 'বাঙ্গালি ভদ্রলোক'-এর ফ্লেভার ভরা রোমান্টিক উপস্থিতিতে এক কমপ্লিট ম্যান। আবার রোমাঞ্চিত হলাম।

আজ যখন উনি নেই তখন জানলাম পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এই 'বিরল' বাঙ্গালি ভদ্রলোকটি এই বঙ্গের সেই কুলীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীভুক্ত নন, কারণ তাঁর মধ্যে ছিটেফোঁটাও bohemian leftist romanticism ছিল না উপরন্তু চিন্তায়, চেতনায় তিনি ছিলেন একজন আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী। তাই তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঠাঁই পেল আনন্দবাজার পত্রিকার ভেতরের কোনো এক পাতার কোনো এক কোণায়। এবার রোমাঞ্চ নয়, অসীম শ্রদ্ধা জাগলো।

প্রকৃতি নরম পালকের মতো হৃদয় স্পর্শ করে

ড. অঞ্জনা পয়ড়া
(বিশিষ্ট অধ্যাপিকা)

অনন্য রচনাশৈলী, মন্ত্রমুগ্ধ চরিত্রের বুনন। পাঠক নিজের অজান্তে ঢুকে পড়ে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে। ঋজুদা এবং ঋজুদার সহযোগী রুদ্র কিশোরদের জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে তিনি এইভাবে এক নতুন ঘরানা তৈরি করেছিলেন।

একাধারে কালজয়ী লেখা, ভালো গান গাওয়া, ভালো ছবি আঁকা, সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। শৈশবে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতেন। আবার দেশ ও ধর্মের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখায় পাওয়া যায় 'আমরা ইংরেজদের তো বটেই, পারসিক, মোগল, আফগান, তুর্কিদেরও তা তাঁরা এখানে এসে রাজ্যপত্তন করুন আর লুটেরা বা ধর্ষণকারী হন, কুষ্ঠি, ঠিকুজি-মুখস্ত করে রাখি। কিন্তু আমাদের নিজেদের পৌরাণিক কাহিনি তো বটেই ইতিহাসও জানি না। জানিতে চাই না, উলটে জানতে লজ্জাবোধ করি। আর এই লজ্জা বাঙ্গালিদেরই। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কালজয়ী ভারতীয় কথা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। অতি সম্প্রতি, তাঁর অমরলোকে যাত্রা, বাংলা সাহিত্যের ইন্দ্রপতন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি, একটা নতুন ধারায় আবর্তিত করেন। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট ছিল অপরূপ প্রকৃতিময়তা। বর্ণনা দিয়ে পাঠকের মনে ছবি আঁকতেন। বনজ্যোৎস্নার মায়াবী সবুজ অন্ধকার, মাদলের ভ্রিম্ ভ্রিম্ ছন্দ, ঝিঁঝি পোকার আলাপ, দোয়েলের ডাক, ডাহুকের কুইক, ঘুঘু— এ সবের অনুভূতি, নরম পালকের মতো ছুঁয়ে গেছে আমাদের হৃদয়কে। অরণ্যময় প্রকৃতির শখে জীবনের বন্ধন, নারী ও প্রেম সব মিলেমিশে একাকার হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের রোম্যান্টিক চরিত্রগুলি, পাঠক জীবনচর্চা লিখিয়েছে, প্রেমকে জীবনের ক্ষেত্রে সুচারু রূপে রূপান্তরিত করতে বর্ণময় তাঁর লেখা। ◻

বুদ্ধদেব গুহর ‘সারস্বত’ ও আনন্দবাজার পত্রিকা

সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, বাংলা সংবাদপত্র-সাহিত্যজগতে ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটের সাদা বাড়িটার (অর্থাৎ আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস) একটা স্বতন্ত্র মূল্য ছিল। ওই বাড়ির জার্সি পরলেই তুমি সিংহ আর জার্সি খুললেই তুমি পুনর্মুষিক ভব। দুজনকে এর ব্যকিক্রম বলে মনে করেছিলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়, প্রথমজন বরুণ সেনগুপ্ত, বর্তমান পত্রিকার কিংবদন্তি সম্পাদক, অপরজন সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। কথাটা এক অর্থে সত্যি। বাংলা সংবাদ- সাহিত্য জগতে আনন্দবাজার পত্রিকার দাপটের কথা সবাই জানেন, কিন্তু এই দাপটেও মাথা নত না করার মানসিকতা দেখিয়েছিলেন একমাত্র এই দুজনেই— এক, বরুণ

সেনগুপ্ত, দুই, বুদ্ধদেব গুহ।

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা লিখেছেন ‘সারস্বত’। তার ছত্রে ছত্রে আনন্দবাজার সম্বন্ধে কতগুলি সত্যি কথা রয়েছে, যা বাংলা সংবাদ-সাহিত্য দুনিয়ার ছবিটা স্পষ্ট ভাবে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে দেয়। ‘দেশ’ পত্রিকায় জঙ্গল অভিযানের কাহিনি পাঠানো ও পুজো সংখ্যায় ছাপার কথা দিয়েও তা যথাসময়ে না ছাপা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পর্কের আদি সূত্রপাত। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় তাঁর গল্প সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হলেও দেশ পত্রিকার কিংবদন্তি সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে তাঁর প্রথম দিনের বৈরিতা অব্যাহত ছিলই। কিন্তু এই সাগরময় ঘোষেরই শেষদিন পর্যন্ত তিনি খোঁজখবর নিয়েছেন এবং যাঁদের জন্য সারাজীবন ধরে সাগরময় এত করেছেন (পড়ুন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী) তাঁরা তখন তাঁর খোঁজখবর রাখার প্রয়োজনই মনে করেনি। অসুস্থ সাগরময়-জায়ার কাছ থেকেই এই স্বীকৃতি তাঁর জুটেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ‘সারস্বত’-এ বুদ্ধদেব গুহ লিখেছেন :

‘...করবেন নাই-বা কেন? The King is dead, long live the king। তাঁদের অধিকাংশই তো বুদ্ধিমান দুর্বুদ্ধিজীবী।’

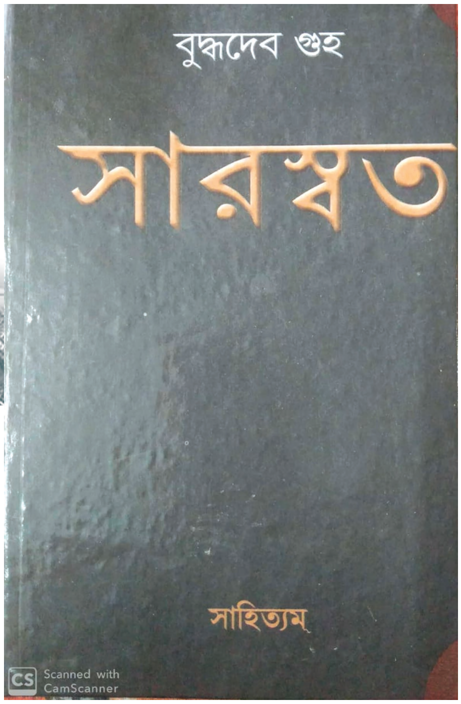

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর অমোঘ মূল্যায়ন : ‘ওঁরা একদল আশ্চর্য জীব। মালিক যদি কারোর সঙ্গে হেসে কথা বলেন, তাহলে তাঁরা সেই ব্যক্তিকে পুজো করেন আর মালিকের সঙ্গে যদি যোগাযোগ না থাকে তবে সেই মানুষকেই বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অতজন মানুষের কোনো নিজস্বতা বা ব্যক্তিত্ব যে কীভাবে উবে যেতে পারে হঠাৎ করে, একথা ভাবলে তাঁদের চরিত্রের রকম সম্বন্ধে বড়ো অনুকম্পা জন্মায়।’

আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্বন্ধে এরকম নানা মূল্যায়নে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে ‘সারস্বত’। আনন্দবাজারকে নিয়ে তাঁর সুখস্মৃতিও নিঃসন্দেহে কম নেই। কিন্তু সংবাদ-সাহিত্য জগতের এক নম্বর হওয়ার বাসনায় অন্যান্য ছোটো পত্রিকাগুলোর সম্পর্কে বিমাতৃসুলভ আচরণ আখেরে যে বাংলা সাহিত্য জগতেরই অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, সেই ইতিহাসও ধরা রয়েছে ‘সারস্বত’-এ। আর সেই সঙ্গে এই গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি যে বাংলা সংবাদ সাহিত্যের মান-অবনমনের সাক্ষী থেকেছে উঠে এসেছে তাও।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বুদ্ধদেব গুহের রক্তে। আনন্দবাজারও তার ব্যতিক্রম হবে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর যে মূল্যায়ন তিনি করেছেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তার প্রাসঙ্গিকতা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সারস্বত-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। □

হাঙ্গেরির নিকোলেটটা ইনসেজের গবেষণায় স্তম্ভিত বিশ্ব

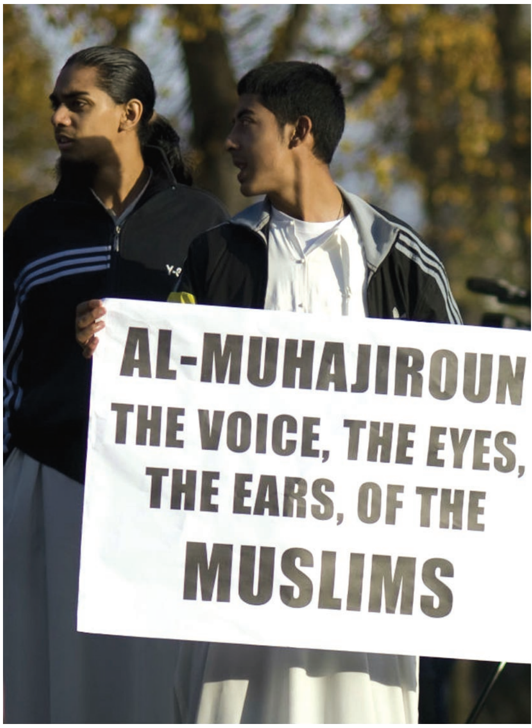

মুসলমানদের জন্মহার হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান বা প্রাচীন স্বদেশজাত অন্যান্য সমস্ত সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু, যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষের চেয়ে ঢের বেশি। তাদের জনসংখ্যা এতো বেশি যে এই শতাব্দীর শেষে গিয়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫০% পেরিয়ে যাবে।"

নৃপেনপ্রসন্ন আচার্য

শিক্ষিত বাঙ্গালি মাত্রই (বিশেষত বামপন্থী এবং মার্ক্সবাদী সম্প্রদায়) বিশ্ববিশ্রুত 'হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

যথার্থই হার্ভাড আধুনিক পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে গহন অনুসন্ধান ও গবেষণা করে চলেছে। পৃথিবীব্যাপী ইসলামীকরণ সম্পর্কিত গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে উঠে এসেছে, যা সারা বিশ্বকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছে।

২০১৯ সালে ২২ জুন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ নিকোলেটটা ইনসেজ (Nikoletta Incze) হাঙ্গেরির জাতীয় টিভিতে এক ভাষণে যে তথ্য পেশ করেছেন, তা পরিবেশনের প্রয়াস করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

ইনসেজ (Incze) বলছেন, বর্তমান সময়ের বহু ইসলামিক দেশ আদতে খ্রিস্ট মতাবলম্বী দেশ ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ, তুর্কিস্তান, ঈজিপ্ট, সিরিয়া, বোনন ইত্যাদি দেশগুলি আদতে খ্রিস্টান দেশ হিসাবেই পৃথিবীতে পরিচিত ছিল। পৃথিবীতে আরও অনেক দেশে মুসলমানরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের ওপর নিজ ধর্ম সংস্কৃতি ও কট্টরপন্থী আচারবিচার জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। আমূল পরিবর্তন করে আজ সেগুলিকে পূর্ণরূপে ইসলামি দেশ করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান আদতে ছিল হিন্দুভূমি, আফগানিস্তান (গান্ধার) ছিল বৌদ্ধ মতাবলম্বী। স্মরণ করুন, বামিয়ান বুদ্ধ মূর্তি যুগলের কথা, স্মরণ করুন মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারীর কথা। আর এক দেশ ইরান যা আদতে ছিল জুরাস্ট্রিয়ান, আজ পৃথিবী তাকে ইসলামি দেশ হিসাবেই চেনে।

ইনসেজ (Incze)-এর মতানুসারে, কোনও দেশের জনসংখ্যার বিন্যাসে যখন শতকরা ১৬% মুসলমান হয়ে যায়, তখন সেই দেশের ইসলামীকরণ রোধ করা প্রায় অসম্ভব। পরবর্তী ১০০ থেকে ১৫০ বছরে সেই দেশ সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক হয়ে যেতে বাধ্য।

ডক্টর পিটার হ্যামন্ড তাঁর লেখা বই, 'দাসত্ব, সন্ত্রাসবাদ এবং ইসলাম' ('Slavery, Terrorism and Islam') -তে বলেছেন, "ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, কোনও উপাসনা পদ্ধতিও নয়, এর পূর্ণ বিকাশে এটি একটি ১০০% রাজনৈতিক আগ্রাসনের জীবনশৈলী— a political encroaching system of life, ইসলামের নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত মজহবে আইনি, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সামরিক অনুষঙ্গ রয়েছে।"

পৃথিবীর সমস্ত উদার, মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ ইসলামি আগ্রাসনের বিশেষ শিকার, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিরা।

ডক্টর হ্যামন্ড বলছেন, "যখন রাজনৈতিক রূপে আদর্শ, সহিষ্ণু, সাংস্কৃতিক ও বহুভাষিক বিবিধতায় সমৃদ্ধ সমাজ প্রাথমিক ভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তখন ধীরে ধীরে ইসলাম সেই সহিষ্ণু সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করে।" বিগত ১৪০০ বছরের পৃথিবীর ইতিহাস তাই বলে। এই আগ্রাসনের একটা বিশেষ (পরিকল্পিত) ধরন আছে। যতদিন মুসলমান জনসংখ্যা কোনও দেশের মোট জনসংখ্যার ২% এর কম থাকে, ততদিন তারা মোটামুটি শান্তশিষ্ট সংখ্যালঘু সেজে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের জন্য কোনোরকম 'আপদ বা সঙ্কট' সৃষ্টি না করে চুপচাপ বসবাস করে। যেমন ধরুন এখনকার ঃ

আমেরিকায় মুসলমান ০.৬%, অস্ট্রেলিয়ায় ১.৫%, ক্যানাডায় ১.৯%, চীনে ১.৮%, ইটালিতে ১.৫%, নরওয়েতে ১.৮%। তাই এখানে এরা খুবই ভদ্র আচরণ করে। একবার মুসলমান জনসংখ্যা ২% থেকে ৫% পৌঁছানো মাত্র তারা সে দেশের তুলনামূলক ভাবে সংখ্যালঘু (মূলনিবাসী) ভূমিপুত্র, অসন্তুষ্ট জনগোষ্ঠী আর সড়কছাপ মাওয়ালী বা সমাজচ্যুত অপরাধীদের সঙ্গে নিয়ে ধর্মান্তরণের মাধ্যমে দলভারী করা শুরু করে। যেমন চলছে এখন—ডেনমার্কে ২%, জার্মানিতে ৩.৭%, ইংল্যান্ডে ৩.৭%, স্পেনে ৪%, থাইল্যান্ডে ৪.৬%।

ডক্টর হ্যামন্ড বলছেন, "একবার মোট জনসংখ্যার ৫% হয়ে উঠলেই তারা নানাভাবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে অন্যদের ওপর।" যেমন, স্থানীয় বাজারে ইসলামি মতে গ্রাহ্য 'হালাল' মার্কা খাদ্যসামগ্রী রাখার জন্য প্রশাসনের কাছে চাপাচাপি শুরু করবে। বিপণন সংস্থায়, অফিসে,

কারখানায়, ক্যান্টিনে, রেস্তোরায়, দোকানে ‘হালাল মার্কা (সার্টিফায়েড)’ খাবার-দাবার রাখতে চাপ সৃষ্টি করবে, প্রয়োজনে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দেবে। ঠিক এমনটাই ঘটছে এখন---ফ্রান্সে ৮%, ফিলিপিন্সে ৫%, সুইডেনে ৫%, স্যুইজারল্যান্ডে ৪.৩%, নেদারল্যান্ডসে ৫.৫%, ত্রিনিদাদে টোবাগোতে ৫.৮%। এরপরই তারা সেই দেশের মধ্যেই প্রথমে নিজেদের সম্প্রদায়ের (মুসলিম অঞ্চলে) জন্য শারিয়া আইন প্রচলিত করার জন্য সে দেশের সরকারের কাছে দাবি জানাতে শুরু করে। জনসংখ্যার ১০% পৌঁছনো মাত্রই তারা প্রাথমিক ভাবে নিজেদের ধর্মাবলম্বীদের নানান অসুবিধার কথা তুলে সেদেশের আইন শৃঙ্খলা ভাঙা শুরু করে। আন্দোলন, মিছিল, হরতাল শুরু করে।

ডক্টর হ্যামন্ড বলছেন, “ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে বর্তমানে প্যারিসের রাস্তাঘাটে। আমরা ইতিমধ্যেই গাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনা দেখছি। যে কোনও অমুসলমান কার্যকলাপই মুসলমানদের রোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।” যেমন পশ্চিমবঙ্গেও ঠাকুর বিসর্জন, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী পালন, শাঁখ বাজানো, দুর্গাপূজা, অমুসলমান বিশেষত হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান (উৎসব নয়) ঘিরে নানা আছিলায় বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন এবং সেই রোষ থেকে হুঁশিয়ারি, তর্জন-গর্জন, হিংস্র প্রদর্শন, সামুদায়িক হিংসা ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতেও CAA, NRC ঘিরে সদ্য প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভয়ানক হামলা, অগ্নিসংযোজন ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে।

যেমন ঘটছে আমস্টারডমে, ফ্রান্সে। পয়গম্বরের ব্যঙ্গচিত্র, ধর্ম সম্পর্কিত সিনেমা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে নিত্যদিনের গণ্ডগোল হচ্ছে। যেমন ঃ গায়ানাতে—১০%, ভারতে—১৮% (যদিও প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি বলেন অধিকাংশ মানুষ), ইজরায়েলে---১৬%, কেনিয়াতে---১০%, রাশিয়াতে---১৫%। ২০%-এ পৌঁছলেই হিংস্র আন্দোলনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে। ২০% ছাড়াতেই ভয়ংকর দাঙ্গা, জেহাদি কার্যকলাপ, বিক্ষিপ্ত খুন-জখম-গণধর্ষণ, ধর্মস্থলের পবিত্রতা নষ্ট করা, অগ্নিসংযোগ প্রাত্যহিক জীবনের ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে শুরু হয় তাহার্রুষ গামাই অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের নৃশংস অত্যাচার।

উদাহরণ---ইথিওপিয়াতে ৩২.৮%। জনসংখ্যার ৪০% এ গিয়ে দেশের মূলনিবাসী জনগণের অভিজ্ঞতা হবে গণহত্যা, লাগাতার রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসংঘাত, গোষ্ঠীকোন্দল নয়, সামুদায়িক যুদ্ধ, যেমন চলছে ঃ বসনিয়াতে---৪০%, চ্যাডে---৫৩.১%, লেবাননে—৫৯.৭%।

৬০% এ পৌঁছনোর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো অমুসলমান অবিশ্বাসী ‘কাফের’-দের একদম খতম অভিযান। শুরু হবে, ‘এথনিক ক্লিনজিং’, গণহারে খতম অভিযান, চূড়ান্ত উৎপীড়ন, জিজিয়া ট্যাক্স, অমুসলমান মহিলাদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, জোর করে বিয়ে করে ধর্মান্তরণ করা। যা এই দেশগুলোতে রোজ ঘটছে ঃ আলবানিয়াতে---৭০%, মালয়েশিয়াতে ---৬০.৪%, কাতারে---৭৭.৫%, সুদানে—৭০%।

যখন মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে, তখন অমুসলমান জনগণের মুখোমুখি হতে হবে প্রাত্যহিক ধমকি, জেহাদ, রাষ্ট্র মদতে গণহত্যার। কারণ অবিশ্বাসী কাফেরদের উৎখাত করে গড়ে তুলতে হবে ১০০% মুসলমান জনসংখ্যাবলহুল পূর্ণ ইসলামি দেশ.....যার বাস্তবায়ন দেখা গেছে ঃ ইজিপ্টে---৯০%, গাজাতে---৯৮.৭%, ইন্দোনেশিয়াতে—৮৬.১%, ইরানে—৯৮%, ইরাকে---৯৭%, জর্ডনে---৯২%, মরোক্কোতে---৯৮.৭%, প্যালেস্টাইনে —৯৯%, সিরিয়াতে—৯০%, তাজিকিস্তানে —৯০%, টার্কিতে—৯৯.৮%, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে—৯৬%, বাংলাদেশে—৮৩%, পাকিস্তানে—৯৭%।

এবার ১০০% জনবসতিবহুল মুসলমান সমাজ তাদের মতো করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে---যাকে ‘ইসলামি শান্তি’ বলে--- ‘দার-উল-ইসলামের’ শান্তি। সকলেই যেহেতু মুসলমান, সেখানে তাই শান্তি প্রত্যাশিত। যেখানে স্কুল মানেই মাদ্রাসা, একমাত্র ধর্মীয় শব্দ হলো ‘কোরআন’।

যা আজ এই দেশগুলিতে বাস্তব ঃ আফগানিস্তানে---১০০%, সৌদি আরবে—১০০%, সোমালিয়াতে—১০০%, ইয়েমেনে— ১০০%।

ডক্টর হ্যামনেহর সুদীর্ঘ গবেষণা অনুযায়ী “এই চরম শান্তি প্রতিষ্ঠার ইসলামিক ধারণা (সম্ভবত) কখনই বাস্তবায়িত হয় না, কারণ দুর্ভাগ্যবশত ১০০% জনসংখ্যায় পৌঁছে কট্টরপন্থী জেহাদি গোষ্ঠীরা নানাবিধ কারণে তাদের রক্তপিপাসা মেটাতে তুলনায় কম কট্টর মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংহার শুরু করে”..... “একটা বিষয় পরিষ্কার করে বোঝার আছে, যেসব দেশে মুসলমান জনসংখ্যা ১০০% এর অনেক কম, যেমন ফ্রান্স, সেখানেও অদ্ভুতভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানরা আশেপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস না করে সেই সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের আরবি কায়দায় নিজেদের আলাদা ঘেটো বানিয়ে ঘেরাটোপের অপরিচ্ছন্ন ঘুপচি অঞ্চলে একত্রে বসবাস করে, যে অঞ্চলে কিন্তু শুধু মুসলমানরাই ১০০%, আর কাউকে শান্তিতে টিকতে দেয় না। উদাহরণ বার্মিংহাম..... আর তাদের সেই ঘেরাটোপের মধ্যে তারা সকলে শরিয়ত আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করে, না হলে সরকারকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, ...দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক আইন মানতে চায় না এবং তারা চায় না যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সেখানে আদৌ প্রবেশও করে।”

হ্যামন্ড জনসংখ্যার বিন্যাস নিয়েও চিন্তিত। তাঁর কথায়, “বর্তমানে ১.৫ বিলিয়ন মুসলমান সমুদায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২২% হয়ে দাঁড়িয়েছে” ....তিনি আরও বলছেন...... “কিন্তু তাদের জন্মহার হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান বা প্রাচীন স্বদেশজাত অন্যান্য সমস্ত সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু, যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষের চেয়ে ঢের বেশি। তাদের জনসংখ্যা এতো বেশি যে এই শতাব্দীর শেষে গিয়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫০% পেরিয়ে যাবে।” ▮

শিক্ষকদের বিষপানে কলঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গ

বিশ্বপ্রিয় দাস

এই লেখা শুরুর আগেই বলে নেওয়া দরকার যে, রাজনৈতিক ভাবে কারোর স্বার্থ নিয়ে এই লেখা নয়। রাজ্যের লাখো লাখো শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজের স্বার্থে এই লেখা লিখতে হচ্ছে। কয়েকদিন আগের ঘটনা। কিছু শিক্ষিকা, প্রকাশ্য রাস্তায় কিছু দাবি নিয়ে প্রতিবাদ করতে করতেই বিষ পান করে ফেললেন। এর পরের ঘটনা সবার জানা। সংবাদমাধ্যমের কয়েকদিনের শিরোনাম হয়ে শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেল সেই আত্মঘাতী প্রতিবাদ। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে থাকা ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরির সেবকদের জন্য একবারের জন্য দেখা গেল না তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের, যারা সামান্য কোনো কিছু ঘটলেই শাসক দলের পদলেহন করার জন্য রাস্তায় মোমবাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের দোষ দিচ্ছি না। তারা সুবিধাজীবী বলেই এমনটা করেন। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করতে হবে, আর কোন বিষয়ে করতে হবে না, সেটা এরা মস্তিস্ক খাটিয়েই ঠিক করে নেন। আর এখানেই তো বুদ্ধিজীবী তকমার সফলতা।

কাউকে আঘাত করার জন্য বলা হচ্ছে না একথা। গত দশ বছরে শিক্ষকরা নানা বিষয় নিয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন। সে প্রাথমিক শিক্ষক হন বা উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক, টেট সফল চাকরি প্রার্থী হন, বা উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থী। পার্শ্ব শিক্ষকদের কথাও আসে এই প্রসঙ্গে। এমনকী মাদ্রাসার শিক্ষকরাও আছেন এই তালিকায়। এক অর্থে সরকারি বঞ্চনায় জর্জরিত সমস্ত শিক্ষক—শিক্ষিকারা। সবাই পথে নেমেছেন নিজেদের অধিকার রক্ষায়। এবং যুক্তিসঙ্গত দাবির পক্ষে। বিকাশ ভবনের সামনে বা শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসার চিত্র মনে হয় সারা বিশ্বে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দেখা গিয়েছে। আর শিক্ষকদের প্রতিবাদে কখনও জলকামানের আঘাত করা, কখনও আবার লাঠির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা শিক্ষকদের, সেই বিষয়ে এই পশ্চিমবঙ্গ সারা বিশ্বে একেবারে প্রথমে থাকবে বলেই মনে হয়।

শিক্ষকদের প্রতিবাদ কী কী কারণে? কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন সরকার কর্তৃক বঞ্চনার চিত্রটা কী?

প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সংগঠন লাগাতার অনশন শুরু করেছিল। ঘটনাস্থল সেই বিকাশ ভবন সংলগ্ন এলাকা। কী ছিল দাবি? পি আর টি স্কেল দিতে হবে, যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন কাঠামো, অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সব না হলেও, কিছু সুযোগ সুবিধা। মৃত্যুমুখি সেই সব শিক্ষকদের ছবি সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এসেছিল। কয়েকদিন সংবাদমাধ্যম সেটিকে নিয়ে সামান্য উৎসাহিত হলেও, পরে থেমে যায়। কার অঙ্গুলি হেলনে থামতে হলো? সেটা আর না বলাই ভালো। এই দাবি আজো শিক্ষকদের মধ্যে আছে। কেননা তারা নিজের যোগ্যতার মান বাড়িয়েছেন। সরকার যেমনটি চেয়েছেন, ঠিক তেমনটি। অন্য দিকে, সরকার এটাকেই মূল্য দেননি। আজও প্রাথমিক শিক্ষকরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পান না। পুঞ্জিভুত বেদনা রয়েছে তাদের হৃদয়ের গভীরে। নজরুল মঞ্চের সভা থেকে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তি করতেও ছাড়েননি মন্ত্রী কুলপতিরা। এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও শিক্ষকদের সেই সম্মানটুকুও দেখাতে পারেননি। প্রাথমিক শিক্ষকরা কেন পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন, সেটাও একবারের জন্য খুঁজে দেখতে চেষ্টা করেননি। হয়তো বলবেন প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা কেন বলা হলো? তার কারণও আছে, এই যারা বিষপান করে আত্মহননের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল? সেটা নিশ্চয়ই এতদিনে সবাই জানেন। সংবাদমাধ্যমে বহুল প্রচারিত। বদলি ও সঙ্গে ছিল ন্যূনতম বেতন কাঠামো পরিবর্তনের দাবি। অনেকদিন ধরেই বেতন কাঠামো নিয়ে দাবি জানিয়ে আসছিলেন এরা। এদের অভিযোগ, তারা দাবি জানাবার জন্যই, তাঁদের শাস্তি স্বরূপ, দূরান্তরে বদলি। আর যেখানে বদলি করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে কাজ করে খাওয়ার পয়সার সংকুলান হবে না।

'বাংলার মানুষ' নাকি নিজের ঘরের মেয়েকেই চায়। সত্যি তো এই যে পাঁচজন শিক্ষিকা বিষপান করলেন তারা কি আমাদের ঘরের মেয়ে নন? তারা কি আমাদের ঘরের মা বা বোন নন? এই প্রশ্ন উঠছেই। এই সরকারের বা আগের বাম সরকারের চরিত্রগত দিক দিয়ে একেবারে দাড়ি পাল্লায় এক।

এই বদলি প্রসঙ্গে একটি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া উল্লেখ করার মতো ঘটনা আছে। একজন সরকারি হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন। নিজের প্রতি অপরাধ সহ্য করতে না পেরে।

একজন শিক্ষক ন্যূনতম সম্মান চান। এই সরকার কি পারছে সেটা দিতে? যদি পারত, তাহলে শিক্ষিকাদের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতে হতো না। অনশন করে নিজেদেরকে শেষে পথে নিয়ে যেতে হতো না। দাবির জন্য পথে নেমে পুলিশের লাঠি খেতে হতো না। রাজ্যের কয়েক লক্ষ শিক্ষক চায় ন্যূনতম সম্মান। আর যোগ্যতার নিরিখে মূল্যায়ন। কেননা তারা তা পাবার অধিকারী।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি খাদে পড়েছে তৃণমূল আমলে

অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের নগর এলাকা ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রণবতা হচ্ছে আরও বেশি নগরায়ন সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার উলটো।

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

১৯৬০-এর গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি ছিল। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ ছিল তিনটে ধনীতম রাজ্যের অন্যতম- অন্য দুটো ছিল মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। ১৯৮০-র গোড়ায় এটা কমে জাতীয় গড়ের সমান হয়। ১৯৯০-র গোড়ায় দেশের যখন উন্নতি হচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গ নেমে এসেছিল সাতে। ২০০০-এ আরও নেমে হলো ১০ ও ২০১১-তে তৃণমূল সরকারে আসার সময়ে তা হয়েছিল ১১। ওই সরকারের আমলে গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ নেমে এসেছে ১৪ নম্বরে।

১৯৯৩ থেকে ২০০০-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫ শতাংশ, সেখানে জাতীয় গড় ছিল ৪.৬ শতাংশ। পরবর্তী দশক, ২০০০-২০১০ সময়কালে জাতীয় গড় ৫.৫ শতাংশেই থাকে অথচ পশ্চিমবঙ্গে তা নেমে আসে ৪.৯ শতাংশে। আবার ২০১১-২০২০ দশকে জাতীয় গড় একটু নেমে হয় ৫.২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা আরও নেমে হয় ৪.২ শতাংশ। লক্ষণীয় ব্যাপার, ১৯৯০-র দশক পর্যন্ত রাজ্যের বৃদ্ধির হার জাতীয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু পরের দুই দশকে তা ক্রমাগত নামতে থাকে বামফ্রন্ট জমানার শেষ দশকে লাগাতার উন্নয়নবিরোধী আন্দোলনে। পরের দশকে তথাকথিত পরিবর্তনের সরকারের পরিকল্পিত ধ্বংসাত্মক উন্নয়নবিরোধী নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি হার দ্রুত গতিতে নেমে আসে। তদুপরি সংখ্যাতত্ত্ব সবটা প্রকাশ করে না। যারা ক্ষেত্রস্তরে খবর রাখেন তাঁরা টের পাচ্ছেন উন্নয়নের জের কতটা।

ক্ষেত্র অনুসারে রাজ্যের কার্য সম্পাদন :

কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধিহার গত দশকে দেশের বাকি অংশের চেয়ে ভালো। এইরকম উর্বর জমি আর নদী-বৃষ্টি ধৌত অঞ্চলে সেটা না হওয়াই অকৃতিত্বের। বরং কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর বৃদ্ধির হার সূচিত করে উৎপাদন ও পরিষেবাক্ষেত্রে জাতীয় হারে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে। কারণ সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কম ছিল।

ভোগ্যসামগ্রীর জন্য মাথাপিছু খরচ :

শহর ও গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালীর খরচের উপর ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে যে বিবরণ পেশ করেছেন সেই অনুযায়ী সঠিক অর্থে মাসিক মাথাপিছু ভোগ্যসামগ্রী খরচের (২০১১-১২-র পরে উপলব্ধ নয় তবে ২০১৭-১৮ সালে অল্প সময়ের জন্য তা বাজারে ছেড়ে আবার পরে তুলে নেওয়া হয়। তবে তার ভিত্তিতে ১৯৯৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত মোটামুটি এক দশকের ভোগ্যপণ্য খরচের সঙ্গে পরবর্তী দশকের অনুরূপ খরচের আমরা তুলনা করতে পারি গড় হিসাব ধরে নিয়ে) শহরাঞ্চলের ধরনটা অনেকটা আয় বৃদ্ধির মতো। এক্ষেত্রে রাজ্য (৪.২ শতাংশ) জাতীয় গড়ের (৪ শতাংশ) চেয়ে ভালো করেছিল। পরের দশকে তা আরও নীচে নেমেছিল (৩.৮ শতাংশ); জাতীয় গড় ছিল ৩.৭-৪.৭ শতাংশ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে গত দশকে (মানে তৃণমূলের সময়ে) জাতীয় গড়ের চেয়ে পিছিয়ে গেছে। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত পূর্বে গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য খরচ (০.৩ শতাংশ) জাতীয় স্তরের (২.৩ শতাংশ) চেয়ে নীচে ছিল। পরের দশকে রাজ্য (২.৪ শতাংশ) ও কেন্দ্রে (৩.২ শতাংশ) কিছু উন্নতি হলেও রাজ্য কেন্দ্রের পিছনে ছিল। কিন্তু পরের দশকে মানে এখন থেকে ধরলে বিগত এক দশকে যখন তৃণমূল ক্ষমতায় তখন পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি হয় ৫ শতাংশ যেখানে জাতীয় গড় ৩ শতাংশ।

১৯৯৯-২০০০ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যসীমার নীচের (বিপিএল) লোকসংখ্যা ছিল ২৭ শতাংশ আর তখন জাতীয় গড়

ছিল ২৬.১ শতাংশ প্রায় সমান সমান। পরবর্তী দশকে রাজ্যে বিপিএল লোকসংখ্যা কমে হলো ২০ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় দাঁড়াল ২২ শতাংশ। তবে গত দশকে রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে (বিপিএল) লোকসংখ্যা কমে হলো ১৪ শতাংশ কিন্তু জাতীয় স্তরে তা সামান্য বাড়ল— হলো ২৩ শতাংশ।

গত দশকে গ্রামীণ এলাকায় ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, তার কারণ গ্রামের লোকের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। একে কখনো বৃদ্ধি বলে না। সেই কারণে দারিদ্র্য সীমার নীচের বা বিপিএলের জনসংখ্যা কমেছে বা ঘুরিয়ে বলা যায় দারিদ্র্যতা কমেছে বলে যে দেখানো হচ্ছে তা আসলে এই নগদ জোগান দেওয়া। একটা জাতি যখন তার আয় বাড়ায়, উৎপাদন ও পরিষেবা উন্নত করে, সেটাই স্থায়ী উন্নতি আনে জাতির জীবনে। এখানে মানুষের হাতে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তা জাতীয় আয় বা সম্পদ বৃদ্ধি করছে না। সেই টাকা আসছে কোথা থেকে?

এর উত্তর খুঁজতে আমাদের আরও কয়েকটি সূচক দেখতে হবে।

নিম্নমুখী রাজ্য মাথাপিছু নেট জাতীয় পণ্য সব কথা বলে ১ নম্বর থেকে রাজ্য ১৪ নম্বরে এসেছে এমনকী শহরাঞ্চলে দেশের অবশিষ্টাংশের তুলনায় মাথাপিছু মাসিক ভোগ্যপণ্য খরচের নিম্নতর বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করার মতো। এতেই বোঝা যায় শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে খুব শোচনীয়। সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের নগর এলাকা ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রণবতা হচ্ছে আরও বেশি নগরায়ন সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার উলটো। কৃষিক্ষেত্রে তা সারা ভারতের গড়ের চেয়ে সামান্য বেশি— গ্রামীণ আয় কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে কিন্তু এর কারণগুলো নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ নেই।

রাজ্যের গ্রামগুলো থেকে ভীষণ রকমভাবে বাইরের রাজ্যে যাবার ঘটনা ঘটছে। ভূমিহীন গরিবরা আরও সম্পন্ন রাজ্যগুলিতে নির্মাণ কাজ করতে চলে যাচ্ছে। এইসব লোক তাদের সঞ্চয়ের একটা বিরাট অংশ এই রাজ্যে পাঠাচ্ছে, এর থেকে বাড়ি তৈরি ও অন্যান্য গ্রামীণ কাজকর্ম হচ্ছে— এটা গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির একটা কারণ হতে পারে। রাজ্যের পরিকাঠামোর অবস্থা খুবই সঙ্গিন। কলকাতা উত্তর থেকে এনএইচ-৩৪ ধরে ১৬০ কিলোমিটার গাড়িতে যেতে ৬ ঘণ্টা লাগে। পঞ্চাশ বছর আগে লাগত সাড়ে তিন ঘণ্টা। ভারতের উন্নত অংশে এর জন্য সর্বোচ্চ ৩ ঘণ্টা লাগে। পণ্য উৎপাদন বা পরিষেবা দক্ষতা নির্মাণে কোনো বিনিয়োগ হয়নি। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা কোনো কাজই করে না। মানব উন্নয়ন সূচকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২৮ নম্বরে।

রাজ্য সরকারের দেনা বর্তমানের ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা যেটা ২০১১ সালে ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু কেন এই প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসছে ও আসবে। মোদীজী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে রাজ্যের অংশ ৩৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশ হয়েছে। আবার কেন্দ্রীয় বাজেট বেড়েছে ৬.১১ লক্ষ কোটি অর্থাৎ রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে শুধু কেন্দ্রীয় বাজেটের থেকে আগের ৩৩ হাজার কোটি টাকার জায়গায় পাচ্ছেন ৭৮ হাজার কোটি টাকা মানে বেশি পাচ্ছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা বেশি। তা সত্ত্বেও বাজার থেকে রাজ্য সরকার ঋণ নিয়েছে ৫ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার সময়ে ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা। কী হচ্ছে সেই টাকা দিয়ে? তখন খুব চিৎকার করত আমাদের সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে বামফ্রন্টের ঋণ শোধ করতে গিয়ে। আর এখন চুপ কেন?

অন্যদিকে রাজ্য বাজেটে কর বাবদ খাজনা আদায় ধরা হয়েছে ৭৫,৪১৫.৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬১০০ কোটি টাকা আসবে মদ বিক্রি করে। রাজ্য সরকার নিজেই মদ বিক্রি করছে। এর ফলে মদের ডিলাররা একদম বসে গেছে। আর কোনো রাজ্যে এটা হয়নি। খুব ভারী ঋণের বোঝা আর খাজনার সিংহভাগ মদের থেকে আসার অর্থ রাজ্যটাকে সব দিক দিয়ে ডোবানো। অর্থনীতিবিদ প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে ঋণের ফাঁদে পড়ার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মতে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ খাদে পড়েছে। এক দিকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বিশাল টাকা খরচ করছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারকে পুরনো ঋণের আসল ও সুদ শোধ করতে হয়। আবার সরকারকৃত এইসব ব্যয়ের সবটাই প্রায় রাজস্ব ব্যয় যার থেকে কোনো সম্পদ সৃষ্টি হয় না। এই সম্পদ সৃষ্টি হয় যদি কোনো পরিকাঠামো উন্নয়ন বা নতুন শিল্প একক স্থাপন হয় এমন কোনো মূলধনী খরচ হয়। বর্তমান জমি ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের নীতি পরিকাঠামো উন্নয়ন বা নতুন বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে অনুকূল নয়। সুতরাং ঋণ নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই’।

অবশ্য বামফ্রন্ট সরকার রাজস্বের জন্য আবগারি শুল্কের উপর নির্ভর করত। তারা নতুন নতুন মদের দোকান ও বার খোলার অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সরাসরি মদের পাইকারি ব্যবসা অধিগ্রহণ করেছে। এমনকী এই লকডাউন বা প্রায় লকডাউন পরিস্থিতিতে বার ও মদের দোকান খোলা থেকেছে অথচ লোকাল ট্রেন সার্ভিস বন্ধ থেকেছে। কোনো বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়া মদের ওপর এই নির্ভরতা চলবে।

রাজ্যে ৫ লক্ষ শূন্য পদ পূরণ না করে ছয় মাসের চুক্তিতে সিভিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। হাসপাতালে ৭০০ ডাক্তার নিয়োগ হলে ৪০০ জনকে ছেড়ে দেয়। এখন বলছে নার্সদের দিয়ে চিকিৎসা করাবে। সরকারি স্কুলগুলো বন্ধ হওয়ার মুখে; আমি নিজে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ঘুরে সমীক্ষা করে দেখেছি লাইব্রেরি বন্ধ, ৩০০০ ছাত্রের জায়গায় ১০০০-এ নেমেছে, একটা স্কুলে ছয়টা ক্লাস নেওয়ার জন্য হেড মাস্টারকে ধরে ৬ জন শিক্ষক, এক এক জনকে সারাদিন মাঝে মাঝে একসঙ্গে দুটো ক্লাস নিতে হয়। চূড়ান্ত দৈন্যদশা। এইটাই আমাদের ভবিতব্য। এর পরে যদি অন্য কোনো দল সরকারে আসে তারা সরকার চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। Fiscal Responsibility And Budget Management Act in India প্রয়োগ করা দরকার অবিলম্বে। □